মজার গল্প

আবদুল মান্নান তালিব

৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর উপযোগী

মজার গল্প

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

দুটি কথা

জীবনের কথা নিয়ে গল্প। পৃথিবীর বুকে অবস্থান কালটাকেই জীবন বলা হয়, সে জীব হোক বা জড় হোক। মানুষ ও প্রকৃতি সবার একজনই স্রষ্টা এবং সবার একজনই মাবুদ। তিনি আল্লাহ। কুরআন ও হাদীসে যে সমস্ত জীবন কথা, ঘটনা ও কাহিনী বলা হয়েছে সেগুলো জীবন থেকে শিক্ষা নেবার জন্য। সেগুলো আল্লাহ ও মাবুদের সাথে সম্পর্ক নির্ণয়েরও একটি চালচিত্র। তাই বড়দের সাথে সাথে শিশু কিশোরদের জন্যও সেগুলো থেকে শিক্ষণীয় রয়েছে। মজার গল্পের বেশীর ভাগ কাহিনীই কুরআন ও হাদীস থেকে নেয়া। প্রত্যেকটির মধ্য থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। শিশু কিশোরদের মানসিক গঠনই মূল উদ্দেশ্য। একজন মুসলমান, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পিত এবং আল্লাহ ও রসূলের অনুগত বান্দাই শুধু নয়, একজন উন্নত চরিত্রগুণ সমৃদ্ধ মানুষ তৈরিই লক্ষ।

এটা মজার গল্পের ২৪তম সংস্করণ। এ সংস্করণে আগেরগুলোর সাথে দুটো নতুন রচনা সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি আগের মতো এগুলোও গৃহীত হবে। গল্পের বাইরের খোলসটাতো কিছুই নয়। তার ভেতরের বাণীটা হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। নিজের হৃদয়ে জাগাতে হবে সেই সুরের কাঁপন। তবেই মজার গল্প হবে আসলে মজার।

আবদুল মান্নান তালিব
১৮০, শান্তিবাগ, ঢাকা
০৫.০৭.২০০৮

সূচীপত্র

উজ্জ্বল সত্যের শিখা

রোমের বাদশাহ কায়সার।

তার বড় অহংকার। তার জাতির অহংকারও তার চেয়ে কম নয়। তাদের অনেক জ্ঞান। তারা অনেক লেখাপড়া জানে। তাদের বুদ্ধি অনেক। তারা দর্শন, তর্কশাস্ত্র অনেক কিছুই জানে। বুদ্ধি ও তর্কশাস্ত্রের যুক্তির জোরে তারা দিনকে রাত ও রাতকে দিন করে দিতে পারে। আর আরবের মুসলমানরা? তারা কী-ই বা জ্ঞান রাখে! কতটুকুই বা বুদ্ধি তাদের! তলওয়ারের জোরে তারা দুনিয়া জয় করে ফিরছে। কিন্তু বুদ্ধি আর জ্ঞানের বহর তাদের কোথায়? এই শক্তি দিয়ে এবার তাদের হারাতে হবে।

কায়সার তার বুদ্ধিমান উজিরের সাথে বসে পরামর্শ করেন। যুক্তি আঁটেন। ঠিক হয় বুদ্ধিমান উজির যাবেন বাগদাদে মুসলমানদের বাদশার দরবারে। সেখানে তিনি ভরা দরবারে মুসলমান আলেম, জ্ঞানী, গুণী ও পন্ডিতদের তিনটি প্রশ্ন করবেন। যদি তারা প্রশ্ন তিনটির সঠিক জবাব দিতে না পারে তাহলে মুসলমানদের বাদশাহ মনসূর রোমের বাদশাহ কায়সারকে কর আদায় করবেন।

রোমের বুদ্ধিমান উজির বাগদাদে বাদশাহ মনসূরের দরবারে আসেন। বাদশাহ মনসূর তাঁর প্রস্তাব মেনে নেন।

বাদশাহ মনসূর জ্ঞানী গুণীদের জমায়েত করেন। নির্দিষ্ট দিনে মানুষের ভীড় জমে ওঠে দরবারে। রোমের বুদ্ধিমান উজির একটি আসনে বসেন। তিনি প্রশ্ন করতে থাকেন। বিভিন্ন আলেম ও জ্ঞানী লোকেরা তার জবাব দিতে থাকেন। কিন্তু কোন জবাবেই তাঁকে ঠেকানো যায় না। কোন জবাবই রোমের বুদ্ধিমান উজিরের মুখ বন্ধ করতে পারে না।

এ অবস্থা দেখে অবশেষে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি উঠে দাঁড়ান। তিনি দরবারে বসেছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন কথা বলেননি। এবার তিনি বাদশাহ মনসূরের কাছে কথা বলার অনুমতি চান। বাদশাহ তাঁকে অনুমতি দেন।

ইমাম আবু হানিফা (র) রোমের উজিরকে বলেনঃ আসলে আপনি তো এখন প্রশ্নকারী আর আমি জবাব দাতা। কাজেই উঁচু আসনে প্রশ্নকারীর নয় জবাব দানকারীর বসা উচিত।

বাদশাহ মনসূর ইমামের এ কথা সমর্থন করেন।

ফলে ইমাম আবু হানিফার দাবী অনুযায়ী রোমের বুদ্ধিমান উজির উঁচু আসন থেকে নেমে আসেন এবং ইমাম্ আবু হানিফা সেখানে উঠে বসেন। মঞ্চের এই নাটকীয় পট পরিবর্তনে সমস্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশই পালটে যায়।

ইমাম আবু হানিফা রোমের উজিরকে বলেন ঃ এবার তোমার প্রশ্ন বলতে থাকো।

রোমের উজির ঃ আমার প্রথম প্রশ্ন, আল্লাহর আগে কি ছিল?

ইমাম আবু হানিফা ঃ তুমি এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ ইত্যাদি নিশ্চয়ই গুণতে পারো। তাহলে আমাকে একটু বলো, একের আগে কোন সংখ্যা আছে?

রোমের উজির ঃ একের আগে কোন সংখ্যাই নেই।

ইমাম আবু হানিফা ঃ তাহলেই বোঝো, এক তো অংকের একটা সংখ্যা মাত্র! তুমিই বলেছো একের আগে আর কোন সংখ্যা নেই। তাহলে বলো, আল্লাহ যিনি আসলে এক তাঁর আগে কোন কিছু কেমন করে থাকতে পারে?

রোমের উজির ঃ আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, আল্লাহর মুখ কোন দিকে?

ইমাম আবু হানিফা ঃ প্রথমে এ কথার জবাব দাও, প্রদীপের আলোর মুখ কোন দিকে?

রোমের উজির ঃ চারদিকে।

ইমাম আবু হানিফা ঃ তাহলেই বোঝো, আগুন একটা সাময়িক আলো। তার মুখের জন্যে কোন একটা বিশেষ দিক নির্দিষ্ট নেই। তাহলে বলো আসল নূর ও আলো যে আল্লাহ তাঁর জন্যে কেমন করে একটা বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা যেতে পারে?

রোমের উজির ঃ আমার তৃতীয় প্রশ্ন, আল্লাহ এখন কি করছেন?

ইমাম আবু হানিফা ঃ আল্লাহ এখন যে সমস্ত কাজ করছেন তার মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে এই যে, তিনি তোমাকে উঁচু আসন থেকে নামিয়ে আমাকে সেখানে বসিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাকে নামিয়ে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

রোমের বুদ্ধিমান উজিরের মুখ একদম বন্ধ হয়ে গেলো। তার মাথা হয়ে গেলো হেঁট। এই সংগে রোমের বাদশাহ কায়সার ও তার জাতির সব অহংকার লুটিয়ে পড়লো ধুলায়।

আসলে এটা ইমাম আবু হানিফার বা মুসলমানদের বিজয় ছিল না। এটা ছিল সত্য ও ইসলামের বিজয়। এভাবে সব সময়ই অসত্য সত্যের কাছে হেরে গেছে। মিথ্যার অহমিকা ধূলোয় মিশে গেছে। আর তার মধ্য থেকে দীপ্ত হয়ে উঠেছে সত্যের উজ্জ্বল শিখা।

প্রশ্নের জবাব দাও

১. রোমের বুদ্ধিমান উজির বাগদাদের দরবারে আসেন কেন?

২. তিনি কয়টি প্রশ্ন করেন? কে তাঁর প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন?

৩. রোমের উজিরের তিনটি প্রশ্ন কি ছিল?

৪. আল্লাহর মুখ কোন দিকে?

৫. সত্যের কাছে কে হেরে যায়?

সামনে নতুন আশা

বেলা শেষ হয়ে এসেছিল।

চারদিকে ঘরে ফেরার ব্যস্ততা। এতবড় বাজারটা প্রায় একেবারেই ফাঁকা। মাল-পত্তর কেনা-বেচা শেষ করে সবাই যে যার ঘরের পানে ছুটছে। শুধু এক কোণে ছিল একটা ছোটখাট ভীড়। উম্মে আনমার সেদিকে এগিয়ে চললেন।

"এ্যাঁ, তোমরা এই এক রত্তি বাচ্চাটার ওপর একি জুলুম করছো?" উম্মে আনমার ক্রোধে ফেটে পড়লেন।

"তোমরা কি একে মেরে ফেলবে? এতটুকুন বাচ্চার ওপর সবাই মিলে এভাবে কিল, চড়, লাথি, ঘুষি চালাচ্ছো কেন?" বলতে বলতে উম্মে আনমার আমের গোত্রের গোঁয়ার গুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কারো পিঠে ঘুষি চালালেন, কারো বুকে। কাউকে হাত ধরে দূরে হটিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য! এক রত্তি রোগা-পটকা ছেলেটা একটু উহ্ আহ্ করছে না! মরার মত ধুলোয় পড়ে রয়েছে। কি জানি, দেহে প্রাণ আছে কিনা? উম্মে আনমার টেনে তুললেন ছেলেটাকে। তার গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগলেন। অবাক হলেন তার সহ্য শক্তি দেখে।

আমের গোত্রের এই দলটি তাদের সমস্ত মাল-পত্তর বিক্রি করে দিয়েছিল, এমনকি মালবাহী উটগুলোও। শুধু রয়ে গিয়েছিল এই বাচ্চা রোগা পটকা গোলামটি। এখন ব্যবসায়ের জিনিস-পত্তর কেনার জন্য তারা যাত্রা করবে ইরাকের পথে। তারা মনে করেছিল এতবড় হাটে যখন গোলামটি কেনার লোক পাওয়া গেল না তখন পথে কোনো আরব গোত্রের হাতে তাকে বেচে দিয়ে যাবে। কিন্তু সে তো মাটি কামড়ে পড়ে আছে। এক চুলও নড়ছে না এখান থেকে।

"মক্কায় না হয়ে যদি নজদে হতো তাহলে তোমাকে এক হাত দেখিয়ে দিতাম।" এতক্ষণে আমের দলপতি রাগত স্বরে বলল।

"দেখলাম তো, একটুখানি বাচ্চার ওপরই তোমাদের যতো বাহাদুরী।"

"এই অবাধ্য গোলামটির প্রতি এতো মায়া কেন বিবি সাহেবা? এতোই যদি দরদ, তাহলে একে কিনেই নাও না?"

"হ্যাঁ, কিনবোই তো।"

দাম ঠিক হয়ে গেল। উম্মে আনমার বলতে গেলে দিরহামগুলো প্রায় ওদের গায়ের ওপর ছুঁড়ে মারলেন।

লিকলিকে তালপাতার সেপাইটার হাত ধরে জোহরা গোত্রের মধ্য দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলছিলেন উম্মে আনমার। এ বাড়ি ওবাড়ি থেকে টিটকারীর আওয়াজ কানে আসছিলঃ

"ও বিবি সাহেবা, এ লাশটাকে টেনে নিয়ে যাও কোথায়?"

"যেখানেই নিয়ে যাইনা কেন, তোমাদের তাতে কি? এ আমার খেদমত করবে। আমার বাচ্চার সাথে খেলবে।"

সকালে উঠে ঘরের কাজগুলো সেরে উম্মে আনমার বের হলেন বাইরের কাজে। বিকেলে বাসায় ফিরে এসে দেখেন বাচ্চা দুটো খেলার মধ্যে ডুবে আছে। বাচ্চাদের খাইয়ে দাইয়ে কাছে নিয়ে গল্প করতে বসলেন। গোলামটির মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমার নামটা কি বলতো দেখি বাবা?"

"খাব্বাব।"

"তোমার আব্বার নাম।"

"আরাত।"

"আচ্ছা, তোমার মায়ের নাম।"

বাচ্চার মুখ দিয়ে আর কোনো জবাব বের হল না। সে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। উম্মে আনমার তার চোখের পানি মুছে দিলেন। তাকে আদর করলেন। কাঁদতে কাঁদতে খাব্বাব যা বলল তার সার কথা হলঃ

আমের গোত্রের লোকেরা একদিন ধোকা দিয়ে অতর্কিতে তাদের পল্লীতে আক্রমণ চালায়। তার আব্বা ছাড়া গোত্রের পুরুষেরা কেউ বাড়িতে ছিল না। তার আব্বা একাই ডাকাতদের সাথে লড়াই করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ডাকাতরা তাঁকে কাবু করে ফেলে এবং স্ত্রী, ছেলেমেয়ের সামনে তাঁকে জবাই করে। তার মাকে ও বোনকে অন্য গোত্রের হাতে বিক্রি করে।

খাব্বাবের দুঃখের কাহিনী শুনে উম্মে আনমারের দু' চোখ পানিতে ভরে উঠল। উম্মে আনমার খাব্বারের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তাকে আদর করলেন। তাকে নিজের ছেলের মত মানুষ করতে লাগলেন। একটু বয়স হলে তাকে লাগিয়ে দিলেন কামারের দোকানে কাজ শিখতে। উম্মে আনমারকে সে নিজের মায়ের মত মনে করতো।

সমবয়সী গোলামদের সাথে খাব্বাব কাজ করে কামারের দোকানে। বয়স বাড়ার সথে সাথে তার অনুভুতিও বাড়তে থাকে। তখন সে নিজেকে একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে ভাবতে পারে না। গোলামীর জীবন তাকে বেশ পীড়া দিতে থাকে। প্রায়ই তার সমবয়সী গোলামরা নির্জনে বসে আড্ডা জমাতো। কথাবার্তার মধ্যে নিজেদের দুরবস্থার ছবিই তাদের চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠতো। রাগে, দুঃখে তারা কেঁদে ফেলতো। অনেক সময় কঠিন পণ করে বসতো। কিন্তু পরক্ষণেই আশেপাশের আরব পল্লীগুলোর গোলামদের দুরবস্থার কাহিনী তাদের মনে জাগিয়ে তুলতো অন্তহীন নিরাশা।

একদিন পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা। একথা সেকথা নানা কথা। এবারের কথাবার্তায় বন্ধুর মধ্যে নতুন একটা কিছু দেখতে পেল খাব্বাব। মনে হল তার এই বন্ধু নিরাশার সাগর পার হয়ে এসেছে। দুঃখ ও হাতাশার কোন চিহ্নই তার মুখে নেই। আশা আর আনন্দ যেন বারে বারে তার কথার মাঝখানে ছলকে পড়ছে। ব্যাপার কি? হঠাৎ এমন পরিবর্তন। একটু অবাকই হলো খাব্বাব। বেশীক্ষণ নিজের কৌতুহল দমিয়ে রাখতে পারল না সে। এক সময় জিজ্ঞেস করেই বসলো ঃ

"ব্যাপারখানা কি, একটু খুলেই বল দেখি। আজ তোমার মধ্যে যেন একটা নতুন জিনিস দেখছি। অন্য বন্ধুদের সাথে আলাপ আলোচনায় এ জিনিসটি চোখে পড়েছে বলে মনে হয়নিতো কোনো দিন। তুমি কি নতুন কিছুর সন্ধান পেয়েছো?"

বন্ধুটি সাধারণত যেভাবে তার কথার জবাব দিয়ে থাকে সেভাবে না বলে একটু অন্যভাবে বলল ঃ

"পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, তোমার প্রতিপালক অতি মহান! তিনি কলমের সহায্যে শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে কোন দিন জানত না। কিন্তু মানুষ সীমা লংঘন করে কারণ সে নিজেকে মনে করে অভাব মুক্ত। কিন্তু অবশেষে তোমার প্রতিপালকের কাছে অবশ্যি ফিরে যেতে হবে।

বন্ধু বলে চলছিল আর খাব্বারের সমস্ত মন দুলে উঠছিল। মনে হচ্ছিল চারদিকে সমস্ত প্রকৃতিও যেন ঝড়ের আবেগে লুটোপুটি খাচ্ছে। সে আর দাঁড়াতে পারছিল না। তার শরীর দারুণভাবে কাঁপছে।

তার দাঁতে দাঁত লেগে খটখট আওয়াজ হচ্ছে। মনে হল বুঝি সে এখুনি পড়ে যাবে। বন্ধু তাকে এ অবস্থার মধ্যে ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে তার শরীরের কাঁপুনি থেমে গেল। জ্ঞান ও অনুভূতি সজাগ হল। তখন সে বন্ধুকে বলল।

"কি বললে? কি পড়লে তুমি? আমি তো কিছুই শুনতে পেলাম ন। আমার যেন কেমন হয়ে গেল। আবার বল! আবার বল!"

খাব্বাবের অনুরোধে বন্ধু বার বার তাকে পড়ে শোনাতে লাগল। খাব্বাব যেন এক নতুন স্বাদ পেল। তার সমস্ত মন-প্রাণ নেচে উঠল। বন্ধুর বলা কথাগুলো বার বার আওড়াতে থাকল সে-

"কিন্তু মানুষ সীমা লংঘন করে- কারণ সে নিজেকে মনে করে অভাবমুক্ত। কিন্তু অবশেষে তোমার প্রতিপালকের কাছে অবশ্যি ফিরে যেতে হবে।"

"বন্ধু" তুমি একথা কোথায় পেলে? এগুলো তোমার কথা বলে তো মনে হচ্ছে না। বল, বল, কোথা থেকে এসব কথা শুনলে? আমি কি শুনতে পারি না সেখান থেকে?"

"হ্যাঁ, তুমিও শুনতে পার। কোন বাধা নেই। এ কথা, এ বাণী আমার নয়, আসমান থেকে এসেছে। তাহলে চল আমার সাথে আল আমীনের কাছে। তিনিই এসব কথা সবাইকে শুনাচ্ছেন।

আমাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে। আমরা সবাই একমাত্র আল্লাহর গোলাম। সবাই ভাই ভাই। সবাই সমান। নিরাশার মেঘ তোমার আকাশ থেকেও কেটে যাবে। মুক্তি পাবে মানুষের গোলামী থেকে। তবে চল আমার সাথে।"

দু' বন্ধু এগিয়ে চলল। চলল মহানবীর কাছে।

সামনে নতুন দিন। নতুন আশা নতুন আলো। খাব্ববের চোখে নতুন স্বপ্ন।

প্রশ্নের জবাব দাও

১. খাব্বাবের মনে নিরাশা জেগেছিল কেন?

২. বন্ধুটি খাব্বাবের প্রশ্নের জবাবে যা বললো তাতে খাব্বাবের মন দুলে উঠলো কেন?

৩. অবশেষে কোথায় ফিরে যেতে হবে?

৪. বন্ধুটি খাব্বাবকে যে কথাগুলো শুনালো সেগুলো কার কথা? কোথা থেকে এসেছে সেগুলো? কে এনেছেন?

৫. তুমি কি বলতে পারো সামনে কোন্ নতুন দিনটি আসছে এবং কোন্ নতুন আশা জাগছে?

৬. খাব্বাবের চোখে কিসের স্বপ্ন?

আবু জেহেলের হতাশা

বেলা পড়ে এসেছে।

সূর্যটা এখন দেখাচ্ছে একটা লাল গোল থালার মতো। দ্রুত নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। একটু পরেই পাহাড়টার কিনারায় মাথা ঠেকবে। তারপর আস্তে আস্তে আলো সরে যাবে। আঁধারে ডুবে যাবে সমস্ত মক্কা শহর, পাহাড়, উপত্যকা আর বালুর প্রান্তর।

না আর নয়। আজই শেষ করতে হবে। মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে হাতের ছড়িটি ঘোরাতে লাগলো বন্ বন্ করে। ছাগলগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চললো সে উকবা বিন আবী মুঈতের খোঁয়াড়ের দিকে। সে ভাবছে। কিন্তু ভাবনার কোনো কুল কিনারা পাচ্ছে না। খোঁয়াড়ে পৌঁছে ছাগলগুলোকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে খেজুর পাতার দরজাটা ভালো করে বেঁধে দিল। চারদিকে চেয়ে মালিককে খুঁজতে লাগলো। হ্যাঁ, ওইতো উকবা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের বারান্দায়। ছেলে ওলীদ ও লোকজন নিয়ে সলা-পরামর্শ করছে মনে হয়। সে তাদের থেকে কিছু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো।

কি, তুমি কিছু বলবে?

হ্যাঁ আবুল ওলীদ, কাল থেকে নতুন কোনো লোক বা গোলাম দেখো। আমি আর তোমার ছাগল চরাতে পারবো না।

কি ব্যাপার? তুমি হঠাৎ আমাদের ওপর এমন নারাজ হয়ে গেলে কেন? আমরা কেউ কি তোমাকে কোনো কষ্ট দিয়েছি? আমাদের ছাগলগুলো কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছে?

না, কেউ আমাকে কোনো কষ্ট দেয়নি। কেউ আমার কোনো ক্ষতি করেনি। আমি এমনি চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছি। ছাগল চরানোর কাজ আমি আর করবো না।

একথা বলেই সে পেছনে ফিরলো। ছড়িটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ফিরে চললো আবার পাহাড়ের দিকে। উকবার কোনো জবাব শুনতেও সে প্রস্তুত ছিল না। তার পেছনে তার সম্পর্কে কে কি বলাবলি করছে সে দিকেও তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। নিজের চিন্তার অথৈ সাগরে যেন সে হারিয়ে গেছে। চিন্তা করতে করতে কখন যে সে পাহাড়ের কোলে আবার সেই জায়গায় ফিরে এসেছে যেখানে সে দিনের বেলা ছাগলগুলো চরাচ্ছিল, তা তার খেয়াল নেই।

সেখানে পৌঁছেই তার মনে পড়লো সেই দুজন লোকের কথা যারা আজ দুপুরে অদ্ভুত সব কাজ করেছিলেন এখানে। অবাক লাগছে তার কাছে এখনো। কেমন করেই বা এটা সম্ভব হলো? তাঁরা ছিলেন দুজন, মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। মনে হয়

অনেক দূর থেকে আসছিলেন। তাঁরা দুধ চাইলেন আমার কাছে। আমি অস্বীকার করলাম। কোথায় পাবো আমি দুধ। আমার কোনো ছাগল তো বাচ্চা দেয়নি। পেটে বাচ্চা আছে, দু' চার দিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে এমন একটি ছাগলও তো আমার নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য! তাঁদের একজন। তাঁর চেহারাটি অতিশয় মহিমাময়। অনেক বেশী ভদ্র এবং শান্ত তিনি। কি যেন পড়লেন দোয়া। কি মধুর সে বাণী। এখনো যেন কানে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তারপর তিনি কি করলেন ভাবতে এখনো অবাক লাগে। না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। সব চেয়ে রোগা ছাগলটির স্তনে হাত বুলালেন। আর অমনি ঝর ঝর করে দুধ পড়তে লাগলো স্তন থেকে। সে দুধ তারা দু জনে তো খেলেন পেট ভরে। আমিও খেলাম। কী আশ্চর্য, তবুও দুধ শেষ হয় না। আর তার স্বাদই আলাদা। এমন সুস্বাদু দুধ জীবনে কোন দিন খাইনি। দোয়ার বাক্যগুলো যেন এখনো কানে ভেসে আসছে। কিন্তু সবটুকু মনে পড়ছে না।

সে সুমধুর বাণী যেন তার মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। সে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মধুর কথাগুলো আর স্মরণ করতে পারে না। সে পাগল হয়ে যাবে নাকি?

সে ওই রাতে আর ঘরে ফিরতে পারলো না। মানসিক অস্থিরতা খুবই বেড়ে গেলো। মক্কার আশে পাশে পাগলের মতো ঘোরাফেরা করতে থাকলো সারারাত ধরে। এক সময় রাত শেষ হলো। পুব দিকে আলোর রেখা দেখা দিল। রাখালরা ছাগল আর ভেড়ার পাল নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড়েছে। এমন সময় সে শহরে প্রবেশ করলো কিন্তু তার অশান্ত মন শান্ত হলো না। সেই প্রশান্ত ও উজ্জ্বল চেহারার লোকটি ও তাঁর সাথীকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত সে শান্ত হতে পারল না। তাঁদের গোপন আড্ডাটির সন্ধানও সে জেনে নিল। তার খুশি আর দেখে কে। সে যেন সাত রাজার ধন পেয়ে গেছে। সে তাঁকে দেখলো। জানলো তিনি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সে তাঁর মজলিসে বসলো। তাঁর কাছে গেলো। আরো কাছে। অনেক কাছে। তাঁর একেবারে মুখোমুখি হলো। উদ্বেগ আকুল স্বরে বলতে থাকলো, আমাকে আর একবার শুনান সেই কথাগুলো যেগুলো গতকাল বলেছিলেন। সেগুলো আমাকে শিখিয়ে দিন।

তিনি প্রশান্ত হাসি হাসলেন। সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। গাঢ় স্বরে বললেনঃ আমি জানি তুমি লেখাপড়া জানো। তোমার তো বেশ বুদ্ধি জ্ঞান হয়েছে।

মক্কার এই কিশোরটির মনে ঝড় উঠলো। কি জানি তার যেন কেবল মনে হতে থাকলোঃ তার জন্ম বৃথা নয়। সে নিজের জন্য জন্মেনি। সে নিজের পরিবারের লোকদের জন্য জন্মেনি। উকবা বিন আবী মুঈতের ছাগলের পাল চরাবার জন্য তার

জন্ম হয়নি। তার জন্মের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য। তার জন্ম হয়েছে আজীবন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকার জন্য। তাঁর কাছে বসার, তাঁর বাণী শুনার, সেগুলো মুখস্ত করার এবং তাঁর কথা মানুষের কাছে প্রচার করার জন্য।

এই হালকা পাতলা গড়নের কিশোরটি যেমন ছিল রোগা তেমনি দুর্বল। কিন্তু বুদ্ধি ছিল এমন তীক্ষ্ণ যেন ধারাল ছুরির ফলা। গতি ছিল তার এত দ্রুত যেমন গনগনে আগুনের শিখা। কিছু দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোহবতে থেকে সে অনেক কথা শিখে ফেললো। ইসলামের অনেক কিছু জেনে নিল। এখন তাকে দেখা যায় মক্কার সবখানে। কখনো বাজারে, কখনো রাস্তায়, কখনো পথের চৌমাথায়, কখনো মাঠের এক কিনারে রাখালদের মধ্যে, কখনো কাবাঘরের চত্বরে। যেখানেই তার সন্ধান পাওয়া যায়, দেখা যায় সে কিছু বলছে এবং তার চারদিকে উৎসুক জনতা। সব জায়গায় সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা প্রচার করে বেড়ায়। আল্লাহর বাণী মানুষকে শোনায়। তার প্রচারের তীব্রতা কুরাইশদের কাছে একটা নতুন বিপদ মনে হলো। তারা তার প্রচার কাজে বাধা দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। কিন্তু তার নাগাল পাওয়া ভার। শুনলো সে উকায বাজারে বক্তৃতা দিচ্ছে। লোকেরা তার কথা গোগ্রাসে গিলছে। অনেক লোক তার দিকে ঢলে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। একথা শুনে কুরাইশদের একটি দল ছুটলো উকাযের দিকে। কিন্তু গিয়ে দেখল সে আর নেই। সেখানে জানা গেলো বাতহা উপত্যকায় চলে গেছে সে। বাতহার লোকেরা তার কথায় মুগ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু বাতহায় গিয়েও তারা তাকে পেল না। শুনলো এই মাত্র সে চলে গেছে আমের গোত্রের মধ্যে। এভাবে কিছু দিনের মধ্যে কুরাইশদেরকে নাকাল করে দিল সে। এই এখানে তো এই সেখানে। এখন আছে এখন নেই। যেন মুহূর্তে কর্পূরের মত উবে গেলো। একদিন আল্লাহর দুশমন আবু জেহেল বিরক্তি ও ক্ষোভের চরমে পৌঁছে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল ঃ

মুহাম্মদের কোনো সাথী আমাকে এতো কষ্ট দেয়নি যেমন এ নওজোয়ানটি দিচ্ছে। সব জায়গায় সে মুহাম্মদের দাওয়াত ছড়াচ্ছে, লোকদের আকীদা-বিশ্বাস-ধর্ম নষ্ট করে বেড়াচ্ছে। এতো করেও তাকে ধরতে পারছি না। কিন্তু একবার বাগে পেলে হয় বাছাধনটি, মায়ের দুধ মনে করিয়ে দেবো।

একদিন আবু জেহেল দেখলো দূর থেকে কাবা ঘরের পাশে কে একজন দাঁড়িয়ে কিছু বলছে। চারদিকে লোকের ভীড়। হালকা পাতলা যুবকটি কিন্তু কণ্ঠ বেশ জোরালো। তবুও সে কি বলছে জানার জন্যে দেয়ালের আড়ালে আড়ালে গুটি গুটি মেরে এগিয়ে

চললো আবু জেহেল। কাছে গিয়ে বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পেলো যুবকটির কথা। কী মধুর স্বরে সে বলে চলেছে ঃ

আর আল্লাহর বান্দা তো তারাই

যারা হেঁটে চলে জমিনের ওপর দিয়ে

ধীরে সুস্থে,

আর মুর্খরা যখন তাদের সাথে কথা বলে

তখন 'সালাম' বলে দেয় তাদেরকে।

আর তারা

যারা তাদের প্রতিপালকের সামনে সিজদায় নত হয়ে দীনতা ও নম্রতার সাথে দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। আর যারা দোয়া করে-

হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু!

দোজখের আযাব থেকে আমাদের দূরে রাখো,

সন্দেহ নেই দোজখের আযাব বড়ই কষ্টকর।

আল্লাহর এ কালাম শুনে আবু জেহেলের বুক দূরু দূরু করতে লাগলো।

কেঁপে উঠলো তার সমস্ত শরীর। তার মনকে সে যদি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতো তাহলে তার মুখ থেকেও ঐ কথাগুলোই বের হতো। আল্লাহর কালাম সত্য, একথা সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলতো। সে নিজেই বলতো- আমি এই আল্লাহর বান্দাদের দলে শামিল হতে চাই।

কিন্তু আবু জেহেল তা করতে পারলো না। তার মনকে স্বাধীন হতে দিল না। গর্ব আর অহংকার তাকে সত্যের পথে দাঁড়াতে বাধা দিল। সে লোকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো যেমন বাজপাখি তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। দাঁড়া তোকে আজ দেখাচ্ছি মজা।

আবু জেহেলের আকস্মিক আক্রমণে লোকেরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তার হুংকারে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার মতো দৌড়ে পালিয়ে গেলো। কিন্তু ইবনে মাসউদ অসম সাহসী বীরের মতো বুক ফুলিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো একা। আবু জেহেল রাগে ফেটে পড়লো ঃ

তোকে বহুদিন থেকে খুঁজে ফিরছি। আজ হাতের নাগালে পেয়ে গেছি। তুই আমাদের গোলাম আর বন্ধু গোত্রের লোকদের আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছিস। আমি বহুদিন থেকে দেখে আসছি তুই এদের আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিস। আজ আমার হাতে তোর মৃত্যু হবে।

ইবনে মাসউদ তার একথার জবাব দিতে চাইলো। কিন্তু আবু জেহেল তা শুনতে চাইলো না। ধনুকের বাঁটটি দিয়ে কষে মারলো ইবনে মাসউদের মাথায়। মাথা ফেটে গেলো। রক্তে ভেসে গেলো ইবনে মাসউদের কপাল, মুখ, জামা, কাপড়। কিন্তু তার কোনো পরওয়া করলো না সে। ঝাঁপিয়ে পড়লো আবু জেহেলের ওপর।

আচ্ছা, এই কথা? তাহলে জেনে রাখো, আমিও হোযাইল বংশের ছেলে।

এই বলে আবু জেহেলের বুকে মারলো এক ঘুষি, একই সঙ্গে মুখে জোরসে এক চড় কষে মারলো।

আবু জেহেল ছিটকে পড়ে গেলো। পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলেও তার চেয়ে অনেক বেশী অবাক হলো সে। সে হলো কুরাইশ দলপতি আর তাকে কিনা অপমান করলো আজ হোযাইল গোত্রের একরত্তি একটি ছেলে। এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

রাগে, অপমানে, ক্ষোভে ফুলতে ফুলতে সে তার গোত্রের লোকদের কাছে এসে বললোঃ হে বনী মাখযুম! তোমাদের মধ্যে যদি একটুও লজ্জা থাকে, নিজের গোত্রের প্রতি যদি একটুও ভালোবাসা থাকে, তাহলে হোযাইল গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের থেকে আমার প্রতিশোধ নাও। সে আমাকে এমনভাবে অপমান করেছে যে একমাত্র তার রক্ত দিয়েই এ কলংক কালিমা ধোয়া যেতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গেই কয়ক ডজন লোক তীর, তলোয়ার, বর্শা নিয়ে ইবনে মাসউদের তালাশে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু বদরের যুদ্ধের আগে আবু জেহেল আর তার মুখোমুখি হতে পারলো না।

প্রশ্নের জবাব দাও

১. আবুল ওলীদের ছাগল চরাবার কাজে ইস্তফা দিলেন কে? কেন ইস্তফা দিলেন?
২. পাহাড়ের কোলে তিনি কি আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিলেন?
৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কিসের নেশায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন?
৪. ইবনে মাসউদ কিভাবে ইসলামের দাওয়াত দিলেন?
৫. ইবনে মাসউদ কিভাবে আবু জেহেলের আক্রমণের জবাব দিলেন?

কৃতজ্ঞ বান্দা

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। কতদিন তা ঠিকমত হিসেব কষে বলা সহজ নয়। তবে কয়েক হাজার বছর হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন দুনিয়ায় এত লোকবসতি ছিল না। পৃথিবীর নানা জায়গায় মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করতো।

সে সময় বনি ইসরাঈলের মধ্যে তিনজন লোকের দুঃখের কোন সীমা ছিল না। তারা অতি কষ্টে দিন কাটাতো। নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য তারা সব সময় দুঃখ করতো আর কাঁদতো।

তাদের একজন ছিল কুষ্ঠরোগী। তার সারা শরীর ছিল ঘায়ে ভরা। তার দু'হাতের আঙ্গুল, পায়ের আঙ্গুল, নাক ও কান পচে খসে খসে পড়ছিল। সেগুলো থেকে উৎকট দুর্গন্ধ বের হতো। শত শত মাছি সব সময় তার পচা ঘাগুলোর ওপর ভন ভন করতো। মানুষ তাকে দেখে দূরে সরে যেতো। তাকে ঘৃণা করতো।

আর একজনের ছিল মাথাজোড়া টাক। তার মাথার কোথাও একগাছি চুল ছিল না। লোকেরা তাকে সব ভাল কাজের পথে বাধা মনে করতো। সকালে কেউ ঘুম থেকে উঠে প্রথমে তার মুখ দেখা পছন্দ করতো না। সবাই তার সংসর্গ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইতো।

তৃতীয় জন ছিল অন্ধ। আল্লাহ তার দু চোখের সব আলো কেড়ে নিয়েছিলেন। দুনিয়ার বুকে সে চলে ফিরে বেড়াতো কিন্তু দুনিয়ার কিছুই দেখতে পেত না। সবাই তার প্রতি সহানুভূতি দেখাতো। সে ছিল সবার করুণার পাত্র।

আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করার জন্যে তঁর এক ফেরেশতাকে পাঠালেন।

আল্লাহর ফেরেশতা গেলেন কুষ্ঠরোগীর বাড়ি। দেখলেন তার মুখটা বড়ই মলিন। সে বসে বসে নিরবে চোখের পানি ফেলছে।

"তুমি কাঁদছো কেন বাপু।" ফেরেশতা সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞেস করলো, "আল্লাহর এই বিশাল পৃথিবীতে তোমার কিসের দুঃখ?"

"নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মনে করে আমার কাঁদা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে কি?" কুষ্ঠরোগী মলিন মুখে জবাব দিল।

"আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।" ফেরেশতা আবার বললেন।

"কি কথা?"

"তুমি কি চাও?"

"এই কুষ্ঠরোগের হাত থেকে মুক্তি ছাড়া আমি আর কি চাইতে পারি?"

"তাহলে তুমি চাও সুন্দর-সুস্থ সবল শরীর, তাই না?

"হ্যাঁ, এ ছাড়া আমার আর কি চাইবার আছে? এই রোগের জ্বালায় আমি শেষ হয়ে গেলাম। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে, তাদের কাছে আমাকে বসতে দেয় না। আমাকে দেখলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।"

"তাহলে আল্লাহর কাছে আমি তোমার জন্য দোয়া করছি।" এই বলে ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

দেখতে দেখতে কুষ্ঠরোগী সেরে উঠলো। তার গায়ের রং পালটে গেল। তার কুৎসিত কদাকার দেহে নতুন লাবণ্য ফুটে উঠলো।

কুৎসিত মানুষটির মধ্য থেকে একটি সুশ্রী, সুস্থ, সবল যুবক বের হয়ে এলো।

ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেনঃ "এবার বলো তুমি কোন সম্পদ বেশী ভালবাস?"

"উট" লোভাতুরের ন্যায় ফেরেশতার দিকে তাকিয়ে সে ঝটপট জবাব দিল।

"এই গর্ভবতী উটটি ধরো। আল্লাহ তোমাকে এর মধ্যেই বরকত দেবেন।" একথা বলেই ফেরেশতা গায়েব হয়ে গেলেন।

সেখান থেকে ফেরেশতা এলেন টাক মাথার কাছে। সে তখন একাকী বসে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে হা-হুতাশ করছিল। অপরিচিত লোককে দেখে খেঁকিয়ে উঠলো, "মরার আর জায়গা পেলেনা? আমাকে জ্বালাতে এলে কেন?"

"একটা কথা জানতে এসেছিলাম।" ফেরেশতা সহানুভূতিমাখা কণ্ঠে বললেন।

"আমার কাছে জানবার মত এমন কি কথা আছে?"

"আমাকে তোমার একজন বন্ধু মনে করো।" ফেরেশতা বললেন। "আমি তোমার উপকার করতে চাই। আমি জানতে চাই তুমি কি চাও? কি পেলে তুমি খুশী হও?"

"আমি ---- আমি কি --- চাই, এ্যাঁ--? মাথাভর্তি কালো চুল ছাড়া আর কি চাইব বল?"

"ও, তাহলে তুমি মাথা ভর্তি চুল পেলেই খুশী?"

সে খুশীতে ডগমগ।

"সত্যিই কি এটা সম্ভব? মাথায় চুল ভরে গেলে লোকেরা আর আমাকে বিদ্রূপ করবে না। তখন কতই না মজা হবে। সবাই আমাকে ভালবাসবে- সম্মান করবে। আমি বুক ফুলিয়ে পথ দিয়ে হাঁটতে পারবো। কিন্তু --- কিন্তু, এটা কি সম্ভব?"

"হ্যা, আল্লাহর কাছে তোমার জন্য দোয়া করছি।" এই বলে ফেরেশতা তার টাক মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তার সারা মাথা কালো কুচকুচে চুলে ভরে গেল। তার চেহারায়ও লাবণ্য ফুটে উঠলো।

ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেনঃ "বলো, তুমি কোন সম্পদ বেশী ভালবাস?"

"গরু, আমি গরু বেশী ভালবাসি" সে সোৎসাহে জবাব দিল।

"তাহলে এই গর্ভবতী গাভীটি রাখো। আল্লাহ তোমাকে এ থেকেই বরকত দেবেন।" একথা বলে ফেরেশতা চলে গেলেন।

এবার ফেরেশতা এলেন অন্ধের কাছে। অন্ধের কাছে সারা দুনিয়াটাই অন্ধকার। সে আল্লাহর এই বিশাল দুনিয়ার কিছুই দেখতে পায় না। তাই নিজের দুঃখের কথা চিন্তা করে বসে বসে চোখের পানি ফেলছিল। ফেরেশতার সাড়া পেয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ "কে ভাই তুমি? অন্ধের কুঁড়েঘরে এলে কি উদ্দেশ্যে?"

"তোমার কাছে সবাই অপরিচিত আর আমিতো অনেক অনেক বেশী অপরিচিত।" ফেরেশতা বললেন, "তবে তুমি জেনে রাখ তোমার এক বন্ধু হিসেবে তোমার কিছু উপকার করার জন্যে আমি তোমার কাছে এসেছি।"

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।" ফেরেশতা আবার বললেন।

"কি কথা, আমার মতো এক নগন্য অন্ধের কাছ থেকে আবার কি কথা জানতে চাও?"

"দুনিয়ার কোন জিনিসটি তুমি সবচাইতে বেশী ভালবাস?"

"আমার মতো অন্ধ দু'টি চোখ ছাড়া আর কি ভালবাসতে পারে?"

"যদি তোমার দু'টি চোখ ফিরিয়ে দেয়া হয়--।" ফেরেশতা তার মলিন মুখের দিকে চেয়ে বললেন।

"আহা, তাহলে কতই না ভালো হয়। আল্লাহর এই বিচিত্র দুনিয়ার কত কিছুই আমি দেখতে পাবো? তাহলে আমি আল্লাহর কাছে অসংখ্য শোকরগুজারী করবো।"

"মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমি তোমার চোখের জন্যে দোয়া করছি।" এই বলে ফেরেশতা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন।

তার চোখের জ্যোতি ফিরে এলো।

"ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! তোমার কি অপার মহিমা! তোমার দয়ার শেষ নেই! তোমার রহমতের অন্ত নেই! আহা! আমি কি দেখছি! আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি! আহা! কি সুন্দর এই পৃথিবী! গাছ-পালা, আকাশ, মানুষ! আহা সব-সব সুন্দর! আল্লাহ! তুমি কতইনা সুন্দর! কতই না ভালো!!"

"আমি আর একটা কথা জানতে চাই" ফেরেশতা আবার বললেন। "কি কথা?" কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে ফেরেশতার দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করলো।

"দুনিয়ার কোন সম্পদ তুমি বেশী ভালবাস?"

"ছাগল আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি।" সে জবাব দিল।

"এই তোমাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলাম। আল্লাহ এর মধ্যে তোমাকে বিপুল বরকত দান করবেন।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

ফেরেশতা চলে গেলেন।

কুষ্ঠরোগী, টাকমাথা ও অন্ধ- তিনজনের মনের আনন্দে দিন কাটতে লাগলো। তারা পশুপালনে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠলো। তাদের প্রতি যত্ন নিতে লাগলো। দিনভর পশুদের চারণ ক্ষেত্রে নিয়ে ফিরতো এবং সাঁঝের বেলা পেট ভরিয়ে পানি পান করিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে আসতো। এভাবে ধীরে ধীরে কয়েক বছর গড়িয়ে গেলো। উটের সংখ্যা বেড়ে গেল। গরুর সংখ্যা বেড়ে গেলো। ছাগলের সংখ্যা বেড়ে গেলো। তাদের তিনজনের অভাব ঘুচলো। এখন তাদের খাদ্য-পানীয়, অর্থ, সম্পদ-কোন কিছুর অভাব থাকলো না। তাদের ধনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মানুষের চোখে তাদের মান সম্মান-ইজ্জত বেড়ে গেলো।

কিন্তু তাদের পরীক্ষার এখনো বাকি ছিল।

ফেরেশতা আবার এলেন কুষ্ঠরোগীর বাড়িতে। তবে এবার তিনি এলেন দরিদ্রের বেশ ধরে।

কুষ্ঠরোগী এখন তো আর রোগী নয়। সে এখন একজন সুন্দর সুশ্রী-সুঠামদেহী যুবক। ধনী যুবক। বহু টাকার মালিক। সে উটের দেখাশুনায় ব্যস্ত ছিল। ফেরেশতা তার সামনে হাজির হলেন।

"তুমি কে হে বাপু? এখানে কি দরকার?" কুষ্ঠরোগী ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। "আমি বড়ই গরীব বাবা। আমি সফর করছিলাম। কিন্তু পথে আমার টাকা-পয়সা সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আমার কাছে একটি কানাকড়িও নেই। কিভাবে দেশে ফিরবো সেই চিন্তায় আমি আকুল। আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন সহায় নেই।

"তোমার এ দুরবস্থার জন্যে আমি দায়ী নই। কাজেই এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?" কুষ্ঠরোগী মুখ বিকৃত করে বললো।

"আমি তোমার কাছে সাহায্য চাইছি। সেই আল্লাহর নামে সাহায্য চাইছি যিনি তোমার দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগ সারিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে সুন্দর, সবল ও সুস্থ শরীর দান করেছেন। তোমাকে এই অসংখ্য উট ও বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছেন। আল্লাহর নামে আমাকে একটি উট দাও। এই উটে চড়ে আমি নিজের দেশে যাবো। আল্লাহ তোমাকে এর বদলায় আরো অনেক দিয়ে দেবেন।"

"দূর হ, "দূর হ, "দূর হ, এখান থেকে! তোর মতো অনেক ভিখারী দেখেছি! ভিখারী সাহেব আবার উটে চড়ে দেশে যাবে। ভড়ং দেখাবার জায়গা পায়নি আর। যা যা। দূর হয়ে যা, এখান থেকে দূর হয়ে যা! আমার এখন অনেক কাজ বাকি। অনেকের হক আদায় করতে হবে। তোর মতো ভিনদেশী ভিখারীকে দেবার মত আমার কাছে কিছুই নেই।" কুষ্ঠরোগী রাগে ফেটে পড়লো।

"আমার মনে পড়ছে" ফেরেশতা বলতে লাগলেন, "আগে তুমি কুষ্ঠরোগী ছিলে। মানুষ তোমাকে ঘৃণা করতো। কেউ তোমাকে কাছে বসতে দিতো না। তুমি ছিলে অত্যন্ত গরীব। পরের কাছে চেয়ে-চিন্তে যা পেতে তাতেই তোমার দিন গুজরান হতো। তোমার কোনো সম্মান ছিল না। কেউ তোমাকে ভালবাসতো না। তারপর আল্লাহ তোমার রোগ সারিয়ে দিলেন। তোমাকে ধন-সম্পদ দান করলেন। আর এই পরম করুণাময় আল্লাহর পথে তুমি একটি উটও দান করতে পারছো না?"

"বেশ বাজে বকতে পারোতো তুমি," কুষ্ঠরোগী রাগে দিশেহারা হয়ে পড়লো, "আমার এ ধন সম্পত্তি আমার বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসছে।"

"ভালো কথা, তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে মনে রেখো, তুমি মিথ্যেবাদী হলে আল্লাহ তোমাকে তোমার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন।"

এই কথা বলে ফেরেশতা সেখান থেকে টাকমাথার কাছে চলে এলেন।

টাকমাথা তখন গরু দেখাশুনায় ভীষণ ব্যস্ত। তার কারো দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসত নেই।

ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার একটি কথাতো শোনো" ফেরেশতা চীৎকার করে বললেন। "তোমরা আজকাল বড্ড জ্বালাতন করছো, কি বলতে চাও শিগগির বলে ফেলো, আমার সময় কম।" টাকমাথা বিরক্তিমাখা স্বরে বললো।

"আমি বড় গরীব। সফরে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার হাতে একটি পয়সাও নেই। কেমন করে দেশে ফিরবো ভেবে পাইনে। আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন সম্বল নেই।"

“আমি কি করতে পারি? তোমার এ অবস্থার জন্যে আমি দায়ী নই।” টাকমাথা মুখ ফিরিয়ে নিল।

“আল্লাহর নামে একটা গরু আমাকে দাও। আল্লাহ তোমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। তোমার মাথায় সুন্দর কালো কালো চুল দিয়েছেন। তোমাকে ধন দৌলত দিয়েছেন, অসংখ্য গরু দিয়েছেন। সমাজে মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই দিয়েছেন।”

“যা যা, তোর মতো অনেক ভিখারী আমার দেখা আছে। আমার দান করার দরকার নেই। এগুলো আমার অনেক মেহনতের ধন। ভাগ ভাগ, তোকে দেবার মত আমার কিছুই নেই।” টাকমাথার কণ্ঠে ক্রোধ ঝরে পড়ছিল।

“আমি জানি তোমার মাথাজোড়া টাক ছিল। লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করতো। তুমি ছিলে বড়ই গরীব। আল্লাহ তোমার ওপর মেহেরবাণী করলেন। তোমার মাথায় কালো কুচকুচে চুল দিলেন। তোমাকে অসংখ্য গরু ও বিপুল ধন-সম্পত্তি দিলেন। সমাজে তোমার মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি দিলেন। এত বড় করুণাময় আল্লাহর পথে তুমি একটি গরুও দান করতে পারছো না!”

“কি কথা বলো তুমি ভিনদেশী ভিখারী? আমি জানি, ভালো করেই জানি, এই বিপুল সংখ্যক গরু, টাকা-পয়সা সব আমার বাপ-দাদার নিকট থেকেই আমি পেয়েছি।”

“ভালো কথা, তোমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আল্লাহ তোমাকে তোমার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন।

এই কথা বলে ফেরেশতা সেখান থেকে অন্ধের বাড়ির দিকে চললেন।

অন্ধ তখন তার ছাগলের পাল নিয়ে ব্যস্ত।

“একটা কথা শুনে যাও ভাই।” ফেরেশতা অন্ধকে ডেকে বললেন।

“কি কথা বল ভাই।”

“আমি একজন গরীব মুসাফির। আমার সফরের শেষ সম্বলটুকুও ফুরিয়ে গেছে। এখন আল্লাহ ছাড়া আমার কোন সহায় নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে একটা ছাগল দাও। সেটা বিক্রি করে আমি কিছু অর্থ সংগ্রহ করবো এবং তার সাহায্যে আমার সফরের কাজ শেষ করবো।”

“আল্লাহ আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে এই বিপুল সম্পদ দান করেছেন। এর মধ্যে তোমারও হক আছে। আমার ভাই, আমি আনন্দের সাথে বলছি,

তুমি নিজের ইচ্ছেমতো ছাগল নিয়ে যাও, একটা কেন, দুটো তিনটে, চারটে, যেক'টা তোমার প্রয়োজন নিয়ে যাও। বরং আমার ভাই, এসবগুলোই তুমি নিয়ে যাও।"

অন্ধ আবেগ ভরে বলে যাচ্ছিলঃ আমার ভাই! আল্লাহ আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। আমি অন্ধ ছিলাম আমাকে চোখ দিয়েছেন। আমি গরীব ছিলাম- আমাকে এই বিপুল সংখ্যক ছাগল দিয়েছেন। আমি তুচ্ছ ও নগণ্য ছিলাম, আমাকে সমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তি দান করেছেন। এই বিপুল নেয়ামত-এ সব তাঁরই দান। তাঁর নামে ও তাঁর পথে এসব দান করলে তিনি আবার এর চাইতে বেশী সম্পদ আমাকে দান করবেন। আমার ভাই! যে কটা ছাগল তোমার প্রয়োজন এখান থেকে নিয়ে যাও।"

এভাবে আল্লাহর দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ফেরেশতা বড়ই আনন্দিত হলেন।

"তোমার ছাগল তোমার থাক। আমার আর প্রয়োজন নেই, ফেরেশতা বলতে লাগলেন, আল্লাহ তোমার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেবেন। তুমি আল্লাহর শোকর আদায় কর কিনা আমি শুধু এতটুকুই দেখতে এসেছিলাম। তোমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি আল্লাহর নেয়ামতের আরো শোকর করতে থাক। আল্লাহ তোমার প্রতি তাঁর করুণা অজস্র ধারায় বর্ষণ করবেন। তোমার অন্য দুই বন্ধু, টাকমাথা ও কুষ্ঠরোগী ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর নেয়ামতের কদর করেনি। তারা শোকর আদায় করেনি। তাই তারা নিজেদের আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। আমার ভাই! আল্লাহ তোমাকে তাঁর করুনার ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। এবার তাহলে চলি।

ফেরেশতা চলে গেলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসের ভিত্তিতে গল্পটি রচিত।

প্রশ্নের জবাব দাও

১. আল্লাহ কাদের পরীক্ষা করার জন্যে তাঁর ফেরেশতা পাঠালেন?
২. তারা কে কি সম্পদ চাইলো?
৩. কুষ্ঠরোগী ও টাকমাথা কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল? না পারলে কেন পারেনি?
৪. অন্ধ কিভাবে পরীক্ষায় সফলকাম হলো?
৫. আল্লাহর শোকর কিভাবে আদায় করতে হয়?

চাষী আল্লাহর অনুগত

এক ছিল চাষী। তার ছিল জমি। এক চিলতে নয়, বেশ খানিকটা। আর সেই জমিতে সে করতো চাষ-আবাদ। চাষী ছিল যেমন সৎ তেমনি চরিত্রবান। সে কারোর জমির আইল ঠেলতো না। প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি করতো না। সব কাজে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতো।

চাষী চাষ করতো নিজের জমি। সকাল হলেই ফজরের নামায সেরে গরুর কাঁধে লাঙ্গল দিয়ে মাঠে নামতো। ক্ষেতে লাঙ্গল দিতো, সার দিতো, বীজ বুনতো, সব কিছু করতো কিন্তু ভরসা রাখতো আল্লাহর রহমতের ওপর। আল্লাহও তেমনি তার মেহনতের ফল দিতেন। তার ক্ষেতে শস্য ঢেলে দিতেন অজস্র। আশে–পাশের সব ক্ষেতের তুলনায় তার ক্ষেতে শস্য হতো অনেক বেশী। আর সব ক্ষেত শুকিয়ে গেলেও বা কোন প্রকার দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে গেলেও তার ক্ষেত সব সময় শস্য-শ্যামল থাকতো।

কিন্তু তার ক্ষেতে এই অজস্র ফসলের রহস্য খুব কম লোকই জানতো। সবাই মনে করতো এ সব বুঝি তার বেশী মেহনতের ফল।

একবার ভীষণ গরম পড়লো। রোদের তাপে ক্ষেতের মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেলো। পুকুরের পানিও শুকিয়ে যেতে লাগলো। গাছ পালায়, ঘরের চালে কাকেরা কা কা চীৎকার করতে লাগলো। সারাটা দুনিয়া যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। হায় আল্লাহ, একি হলো! মানুষ সব সময় আকাশের দিকে চেয়ে থাকতো মেঘের আশায়। কালো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যেতো। কিন্তু আবার পরক্ষণেই প্রবল বাতাস সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতো দেশ থেকে দেশান্তরে। একটু আগেই যেখানে বিপুল আশায় মানুষের মুখ উজ্জল হয়ে উঠেছিল। সেখানে আবার নিমেষেই সব আশা উবে যেতো। মানুষের দুর্ভাবনা বেড়ে গেল। সবাই চিন্তা করতে লাগলো, এবার কি হবে।

বৃষ্টির অভাবে এবার ক্ষেতে ফসল হবেই বা কেমন করে! কিন্তু ওই সৎ চাষীর কোন চিন্তাই ছিল না। তার মনে কোন দুঃখ বা খেদও ছিল না।

লোকেরা মনে করলো, এ বছর বৃষ্টি হচ্ছে না। কাজেই ক্ষেতে ফসল হবে না। ক্ষেতে মেহনত করেই বা কি হবে? আর সৎ চাষীর ক্ষেতে বা ফসল হবে কেমন করে? সে ক্ষেতে মেহনত করলেও তার সব মেহনত বিফলে যাবে। পানির অভাবে একদানাও শস্য পাবে না সে।

এভাবে কিছু দিন কেটে গেলো। একদিন আকাশে কালো মেঘ দেখা গেলো। দেখতে দেখতে সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গেলো। মানুষের মনে আশা জাগলো এবার বুঝি বৃষ্টি

হবে। বৃষ্টি হলো, সত্যি বৃষ্টি হলো। কিন্তু কোথায় যেখানে মাটি নেই, ক্ষেত নেই, পাথর শুধু পাথর। মেঘ তার সব সম্পদ পাথরের ওপর পাহাড়ের বুকে ঢেলে দিয়ে চলে গেলো। মানুষ আবার নিরাশায় ডুবে গেলো।

আল্লাহর মহিমা বোঝা কার সাধ্যি! যে পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছিল তার ওপর থেকে একটি নালা নীচে ক্ষেতের দিকে নেমে এসেছিল। নালাটি ওই সৎ চাষীর ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল।

বৃষ্টি নামতে দেখে ওই ব্যক্তি নিজের ক্ষেতে পৌঁছে গেলো। সে আল্লাহর শোকর গুজারী করলো। কোদাল দিয়ে নালার মুখটি কেটে নিজের ক্ষেতের দিকে ঘুরিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার ক্ষেত পানিতে ভরে গেলো। ফলে অন্যান্য ক্ষেতে কোনো ফসল হলো না। কিন্তু তার ক্ষেতে শস্য ভরে গেলো।

তার ক্ষেতের অবস্থা দেখে, মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগলো। কারোর ক্ষেতে ফসল হলো না, তার ক্ষেতে ফসল হলো কেমন করে?

"এবার তার সব পরিশ্রম মেহনতই তো অর্থহীন ছিল?"

"তা ঠিক, তবে তার জমির মাটি উর্বর।"

"না কখখনো না, আর সব জমির মতো তার জমিও সমান উর্বর।"

"তাহলে কি ব্যাপার? তার জমিতে ফসল হলো কেন?"

লোকেরা অনেক চিন্তা করলো, অনেক বাদানুবাদ করলো কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলো না।

অবশেষে সবাই একবাক্যে বললো ঃ

"চলো তার কাছ থেকেই এর কারণ জানা যাক।"

চলো তার কাছে চলো।

তারা সবাই তার কাছে এলো। তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ "ভাই, একটা ব্যাপারের কোনো রহস্যই আমরা বুঝতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানো। যদি তুমি অসন্তুষ্ট না হও তাহলে তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।"

"নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে। অসন্তুষ্ট হবো কেন?"

"এই কাঠফাটা রোদ্দুরে সবার ক্ষেত ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।----।"

"হ্যাঁ, তা জানি।"

"কিন্তু তোমার ক্ষেত শস্য-শ্যামল হয়ে উঠেছে।"

"হ্যাঁ তাতো সবাই জানে।"

"এই প্রচন্ড গ্রীষ্মে সবার ক্ষেতের মাটিগুলোই শুধু আছে। বৃষ্টি না হবার কারণে কেউ শস্যের একটি দানাও পায়নি।"

"তা অবশ্য আমি জানি।"

"কিন্তু তোমার ক্ষেতে সবুজের সমারোহ, শস্যে সমগ্র ক্ষেত ভরে গেছে।"

"এতে কোন সন্দেহ নেই।"

"আমরা মনে করেছিলাম সবার ক্ষেতের যা অবস্থা তোমার তাই হবে। তবে যেহেতু তুমি বেশী মেহনত করো, ক্ষেতের ও ফসলের বেশী যত্ন নাও, তাই আগে তুমি বেশী ফসল পেতে এবং এবারও কিছুটা পাবে। কিন্তু এত বড় পার্থক্য কেমন করে হলো? কেউ একটি দানাও পেলো না অথচ তুমি পুরো ফসল পেলে, এর কারণ কি?"

"এটাই তো আসল কথা। অথচ এটা তোমরা বুঝতে পারো না।"

সে বলতে শুরু করলো।

"তোমরা যতটুকু মেহনত করো আমিও ঠিক ততটুকুই করি। তোমাদের চাইতে বেশী মেহনত করার শক্তি আমার কোথায়? বরং তোমাদের মধ্যে আমার চাইতে বেশী শক্তিমান লোক আছে। তারা আমার চাইতে অনেক বেশী মেহনত করে। তাদের তুলনায় আমার মেহনত কিছুই নয়।"

"তোমার কথা এক বর্ণও মিথ্যা নয়। তাহলে এর কারণ কি?" তারা বিস্ময় প্রকাশ করলো।

"এর একটি মাত্র কারণ, আল্লাহর রহমত আমার ওপর বিশেষভাবে বর্ষিত হয়। এই সেদিনকার কথাই ধরো। আল্লাহ সেদিন এমনভাবে বৃষ্টি দিলেন যে,তা পাহাড়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নালার সাহায্যে আমার ক্ষেতের মধ্যে এসে পৌঁছলো। যার ফলে আমার ক্ষেত শস্য-শ্যামল হয়ে উঠলো। অথচ অন্য ক্ষেত এক বিন্দুও পানি পেলো না। ফলে সেখানে সব শুকিয়ে গেছে। এর মধ্যে আমার মেহনতের কোন বিশেষ ভূমিকা নেই।"

"হ্যাঁ, ঠিক কথা, তাঁর রহমত ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু তোমার ওপর আল্লাহর এই বিশেষ রহমতের কারণ কি? আমরা সবাই তাঁর এই রহমত থেকে বঞ্চিত কেন?"

সে বলতে শুরু করলোঃ

"ঠিক কথা, আল্লাহ যেমন আমার তেমনি তোমাদেরও। কিন্তু আমার ও তোমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। আমি তাঁর প্রত্যেকটি হুকুম মেনে চলি। প্রতি পদে পদে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করি। আমার কোনো কাজের কারণে আমার আল্লাহ আমার প্রতি

বিরূপ হয়ে গেলেন কিনা সব সময় আমার মনে এ ভয় জাগরূক থাকে। যেমন ধরো আমার ক্ষেতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, ফসল ওঠার সাথে সাথেই আমি তার তিন ভাগের এক ভাগ আল্লাহর পথে খয়রাত করে দেই। বাকী দু'ভাগের এক ভাগ পুনরায় বীজ হিসেবে ক্ষেতে বপন করি এবং অবশিষ্ট এক ভাগ নিজের গৃহে রাখি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমি এ ব্যাপারে কখনও কোনো প্রকার লোভ করি না। আল্লাহ যা দেন তাই তাঁর নেয়ামত মনে করে গ্রহণ করি। তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। তাঁর ওপর সবর করি এবং আল্লাহর শোকর গুজারী করি--- কিন্তু তোমরা ---- তাঁর একটি হুকুমও মেনে চলো না। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একটুও চেষ্টা করোনা। তাঁর পথে এক দানা শস্যও দান করা পছন্দ করোনা।

তোমরাই বলো, এ অবস্থায় আল্লাহর দৃষ্টিতে আমার ও তোমাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য অবশ্যই হওয়া উচিত কিনা? তোমরাই চিন্তা করো, যাদের চোখ আছে আর যাদের চোখ নেই তারা কি সমান হতে পারে?

যারা অন্যের দান গ্রহণ করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তারা কি কখনো সমান হতে পারে? এই পার্থক্যটাকেই আমি আল্লাহর রহমত বলে মনে করি। আমি জানিনা তোমরা একে কি মনে করবে?"

একথা বলেই সে চুপ করে গেলো।

আল্লাহর অনুগত চাষীর কথায় সবার টনক নড়লো। সবাই এক সাথে বলে উঠলোঃ ঠিক বলেছো ভাই। আমরা তো আসলে আল্লাহর বান্দা, তাঁর দাস। তাঁর মেহেরবানী হয় বলেই আমরা জমিতে ফসল পাই। কাজেই এ ফসলে অন্যদের হক আদায় করতে হবে। আমাদের হতে হবে আল্লাহর অনুগত চাষী।

একটি হাদীসের আলোকে গল্পটি রচিত।

প্রশ্নের জবাব দাও

১. সৎ চাষীর ক্ষেতে বৃষ্টির পানি নেমে এলো কিভাবে?

২. সৎ চাষীর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় কেন?

৩. যাদের চোখ আছে আর যাদের চোখ নেই তারা কি সমান হতে পারে? এ কথাটি কে বলেছিল এবং কেন বলেছিল?

৪. চাষীর ফসলে আর কাদের হক আছে এবং সে হক কিভাবে আদায় করতে হবে?

রুজির মালিক আল্লাহ্ জেনো

এক শহরে ছিল এক সৎ যুবক। সারাদিন খাটা-খাটনি করে যা কিছু পেতো তা দিয়ে গুড়-মুড়ি কিনে কোন রকমে কায়ক্লেশে দিন গুজরান করতো। আর আল্লাহর শোকর গুজারী করতো। আল্লাহর প্রতি ঈমান তার কখনো টলমল করেনি। সে বিশ্বাস করতো, আল্লাহ যখন তাকে সৃষ্টি করেছেন তখন তার আহারও যোগাবেন। আল্লাহ তাকে অনাহারে মারবেন না। তাই কোনদিন কিছু উপার্জন করতে না পারলেও সে কারো কাছে হাত পাততো না। মানুষের কাছে ভিক্ষা চাওয়াকে সে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় অপমান মনে করতো।

একবার সে বড়ই কষ্টে পড়লো। কোথাও কোন কাজ পেলো না। পরপর ক'দিন অনাহারে কাটালো। ক্ষুধায় কাতর হয়েও সে কাজের সন্ধানে ফিরতে লাগলো। অবশেষে দুর্বলতার কারণে তার পক্ষে পথ চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। এখন কি করবে সে ভেবে কোন কুল-কিনারা করতে পারছিলনা। তবুও সে চলতে লাগলো। মনে মনে ভাবলো, আল্লাহ হয়তো কোন একটা উপায় করে দেবেন।

কিছুদূর চলার পর নির্জন পথে হঠাৎ সে একটা কাপড়ের থলি দেখতে পেল। থলিটি বড়ই সুন্দর। কি জানি কার থলি এটা নিয়ে আবার কোন ফ্যাসাদে পড়বো। এ কথা চিন্তা করে সে এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আবার মনে হলো, থলিটা আমি না নিলেই বা কি অন্য কেউ তো তুলে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং আমি ওর আসল মালিকের হাতে পৌছিয়ে দেই। একথা চিন্তা করে সে আবার ফিরে এসে থলিটা উঠিয়ে নিল।

সে থলিটা উঠিয়ে নিয়ে উলটে পালটে দেখলো। মনে হলো এর মধ্যে কিছু মূল্যবান জিনিস আছে। সে থলির মুখটা খুলে ফেললো। তার মধ্যে দেখলো একটা মূল্যবান সোনার হার ও কিছু স্বর্ণমুদ্রা। এমনিতো সে অনাহারে ছিল কয়েকদিন থেকে। ক্ষুধায় নাড়ি চোঁ চোঁ করছিল। তার পা পিছলে যেতে লাগলো। চিন্তা হলোঃ এটা পরের জিনিস। আর পরের জিনিস না বলে নেয়া হারাম। কিন্তু তিন দিনের অনাহারের পর এখন তার ক্ষুধায় মারা পড়ার অবস্থা। এ অবস্থায় হারামও হালাল হয়ে যায়। কাজেই এ থেকে তার প্রয়োজন পরিমাণ একটা মুদ্রা গ্রহণ করলে ক্ষতি কি? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরের বিবেক জেগে উঠলো।

বিবেক তাড়া দিলঃ এ হতে পারে না। তিন দিনের অনাহারের পর তুমি কি আল্লাহর ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেললে? আল্লাহ কি তোমাকে নিজের মেহনতের উপার্জন থেকে অন্ন দান করতে পারেন না? তুমি পরের দ্রব্য গ্রহণ করতে যাবে কেন? হাজার হোক এ স্বর্ণমুদ্রা তো পরের। তুমি ভিখ মেগে নয়, তার অগোচরে তার জিনিস গ্রহণ করতে চাও। অথচ আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করতে চাও না। তোমার কাছে ঈমানের সম্পদ আছে। এই তুচ্ছ পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে তোমার সেই ঈমানের সম্পদ হারিয়ে ফেলোনা। এটা পরের ধন এবং পরের ধন হারাম এতে সন্দেহ নেই। কাজেই থলির ধনে হাত দিয়ো না। সে বিবেকের ডাকে সাড়া দিল। আল্লাহর কাছে তওবা করল। তারপর থলিটা ঘরে রেখে তার মালিকের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। মনে করলো, মালিকের খোঁজ করতে করতে হয়তো একটা কাজের খোঁজও পেয়ে যাবে।

শহরের পথে কিছু দূর চলার পর সে একটা ঘোষণা শুনতে পেলো! এক বৃদ্ধ ঘোষণা করছেঃ "আমার একটা মূল্যবান থলি হারিয়ে গেছে। তার মধ্যে সোনার হার ও স্বর্ণমুদ্রা আছে। যদি কেউ পেয়ে থাকে তাহলে তা ফিরিয়ে দিলে তাকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।"

গরীব লোকটি বুঝতে পারলো, সে যে থলিটি পেয়েছে সেটি নিঃসন্দেহে এই বৃদ্ধের।

সে দৌড়ে বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললো ঃ

"আসুন আমার সাথে। আপনার থলির সন্ধান আমি দিচ্ছি।"

বৃদ্ধ তার সঙ্গে চললো। ঘরে গিয়ে সে থলিটি বৃদ্ধের সামনে রাখলো।

আনন্দে বৃদ্ধের দু' চোখের তারা চক চক করে উঠলো। সে তাকে পুরস্কার দিতে চাইলো। পাঁচশো টাকা তার সামনে রাখলো।

"আমি এ পুরস্কার নিতে পারি না," সে বললো। "কেন?" বৃদ্ধের কণ্ঠে বিস্ময়।

"থলি মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য ছিল। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। এজন্য পুরস্কার আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করবো।"

বৃদ্ধ তার জন্য দোয়া করে চলে গেলো।

তারপর বহু দিন অতিবাহিত হয়েছে। দুনিয়ার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু দরিদ্র যুবকের জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। একদা কাজের সন্ধানে তাকে নিজের দেশ ত্যাগ করতে হলো। সে একটি সামুদ্রিক জাহাজে সফর করছিল। আবহাওয়ার

মধ্যে দুর্যোগের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে ভীষণ ঝড়-তুফান শুরু হয়ে গেলো। পাহাড়ের সমান উঁচু উঁচু ঢেউগুলো জাহাজটাকে মাথায় করে নিয়ে নাচতে লাগলো। হঠাৎ একটি বিরাট ঢেউয়ের আঘাতে জাহাজটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। জাহাজের একটি ভাঙ্গা তখতার সাহায্যে যুবকটি ভেসে চললো। ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে আসার পর সমুদ্র তীরে ঝুঁকে পড়া একটা গাছের ডালে তার তখতা আটকে গেলো। সে লাফিয়ে ডালটি ধরে গাছে চড়ে বসলো। তারপর সমুদ্র তীরে নেমে এলো। নিকটে একটি লোকালয়ের সন্ধান পেয়ে সেখানে চলে গেলো। সেখানে মসজিদে বসে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলো।

সে অত্যন্ত সুন্দর করে কুরআন শরীফ পড়তে পারতো। তার গলার আওয়াজও ছিল বড় মিষ্টি। তার কুরআন পাঠে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা তাকে বেশ আদর করতে লাগলো। সে দিনে ছেলেমেয়েদের ও রাতে বয়স্কদের কুরআন শিক্ষা দিতো। ধীরে ধীরে তার প্রতি এলাকার লোকদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বেড়ে গেলো।

সে ছিল অবিবাহিত। তর বন্ধু ও ভক্তের দল তাকে সেই অঞ্চলে বিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। সেখানকার জনৈক খোদাভীরু ধনী বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল। তার একটি অবিবাহিত কন্যা ছিল। তার সাথে ঐ যুবকের বিয়ে দেয়া হলো।

বিয়ের রাতে বর-কনের সাক্ষাত হলো। "এ কি!" কনের গলায় যে হার ঝুলছে তা যে তার নিজের দেশে সেই কুড়িয়ে পাওয়া হার। হারটি সে ভালো করেই চেনে। সে হার তো সেই পথিক ধনী বৃদ্ধকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। তহলে ------ তাহলে সেই বৃদ্ধের কন্যাই কি তার স্ত্রী?

সে ভাবতে লাগলো। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো সেই বৃদ্ধই তার পিতা। আল্লাহর অপার মহিমা ও করুণা দর্শনে যুবক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লো। তার মাথাটি আপনা আপনি আল্লাহর দরবারে নুয়ে পড়লো।

প্রশ্নের জবাব দাও

১. বৃদ্ধের থলিতে কি কি জিনিস ছিল?

২. সৎ যুবক থলিটি বৃদ্ধকে ফেরত দিল কেন?

৩. যুবক কিভাবে দুনিয়ায় তার সততার পুরস্কার পেলো?

৪. ভিখ মাগা, চুরি করা ও মেহনতের উপার্জন কোনটি মানুষের জন্য গ্রহণীয় এবং কেন?

মারা গেলেন কবি

মারা গেলেন কবি আজিম-উশ শান। নামে যেমন আজিম-উশ-শান তেমনি নামও করেছিলেন কবি আজিম উশ-শান। দেদার গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক ও উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। অনেক হাসির কাহিনী লিখে তিনি মানুষকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছিলেন। তাঁর ভক্তের সংখ্যা ছিল অগণিত। সারা দেশে কবি আজিম উশ-শানের নাম জানেনা এমন লোক হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না। যুব কিশোররা তাঁর আশে পাশে সব সময় ভীড় করে থাকতো। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই তাঁকে চিনতো। তাঁর লেখা সবাই পড়তো। তাঁর মৃত্যুতে সারাদেশে শোকের ছায়া নামলো।

জানাজা কাঁধে কবরস্তানের দিকে চললো কবির পরিবার পরিজন, ভক্ত-অনুরক্তের দল। সবারই মুখ মলিন বিষন্ন। মুখে কালেমা পড়ছে সবাই আর মনে মনে কবির জন্য মাগফেরাত কামনা করছে আল্লাহর দরবারে।

দেশ জুড়ে শোক সভা হলো। অনেক শোক গাথা রচিত হলো। ভক্তজনেরা কবির প্রশংসায় গদগদ হলো। যুব-কিশোর সমাজ কবিকে নতুন পথের দিশারী রূপে বরণ করলো। কবির নির্দেশিত পথে তারা পুরাতন রীতি নীতি ও ঘুণে ধরা সমাজ প্রথার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ অভিযান চালিয়ে যাবে বলে ঘোষণা করলো। কবি মরে গিয়েও লাখো মানুষের মনে অমর হয়ে রইলেন।

সেদিন কবির কবরের পাশে আর একটি কবর দেয়া হলো। শহরের এক মস্ত বড় গুন্ডাও মারা গিয়েছিল সেদিন। নামজাদা কবির কবরের পাশে রচিত হলো নামজাদা গুন্ডার কবর।

কবরস্তান থেকে সবাই চলে আসার সাথেই আল্লাহর হুকুমে আজাবের ফেরেশতারা নেমে এলেন। উভয়ের গোর আজাব শুরু হলো। কবি আর গুন্ডা উভয়ের ওপর সমানে আজাব চলতে থাকলো। যতই দিন যেতে থাকলো ততই আজাব বাড়তে থাকলো, আজাবের রূপ ভয়াবহ হতে লাগলো। অবশেষে একদিন আজাবের ফেরেশতারা গুন্ডার আজাব বন্ধ করে দিল। কিন্তু কবির আজাব তখনো সমানে চলছিল। বরং দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল।

কবির ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলো কবি আজিম-উশ-শান ঃ হে আল্লাহ! আমার প্রতিবেশী গুন্ডার আজাব বন্ধ হয়ে গেলো। সে কত বদ লোক। শহরে একশত লোক খুন করেছে। কত লোকের মালমাত্তা লুট করেছে, কত গরীবকে

কাঁদিয়েছে। তার অত্যাচারে শহরের লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তার মৃত্যুতে লাখো লাখো মানুষ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। মানবতার এত বড় দুশমন যে গুন্ডা তার আজাব বন্ধ হয়ে গেলো। আর আমার আজাব এখনো বন্ধ হলো না। আমি কত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লিখেছি, কত লোককে আনন্দ দিয়েছি। আমার মৃত্যুতে নগরে শোকসভা হয়েছে। নওজোয়ানরা শোক মিছিল বের করেছে। আমার মৃত্যুতে মানবতার কতই না ক্ষতি হয়েছে। অথচ আমার এই আজাব এখনো বন্ধ হলো না। আর ওই গুন্ডাটার আজাব বন্ধ হয়ে গেলো। হে আল্লাহ! তোমার এই ইনসাফ তো আমি বুঝতে পারছি না। আমি কি ওই গুন্ডাটার চাইতেও খারাপ? ওর চাইতেও বেশী গুনাহগার?"

আল্লাহ বললেন ঃ "হে আজিম-উশ-শান! আমি ইনসাফ করেছি। আমার জাহানে কনামাত্রও বে-ইনসাফী নেই। সে গুন্ডা। কিছু লোককে সে খুন করেছিল। কয়েকজনের টাকা-কড়ি লুঠ করেছিল। মাত্র কয়েকজনের । সে মারা গেছে। তার কাজও শেষ হয়ে গেছে। তার কাজগুলো খুবই খারাপ। তার যা শাস্তি পাবার সে পেয়ে গেছে। তার শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

"কিন্তু তুমি? তুমি কবি। তুমি গল্প রচয়িতা। তুমি প্রবন্ধকার। তুমি নাট্যকার। তুমি লেখক। লেখার সাহায্যে তুমি মানুষকে পরিচালিত করেছো। আমি তোমাকে প্রতিভা দান করেছিলাম। কিন্তু তুমি তার সদ্ব্যবহার করোনি বরং তাকে অসৎ পথে ব্যয় করে মানুষের মহা ক্ষতি সাধন করেছো। কিয়ামত পর্যন্ত এ ক্ষতি পূরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই। তুমি নিজের লেখার সাহায্যে মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত না করে অসৎপথে চালিয়েছো। তোমার লেখা পাঠ করে যুব সমাজ উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে ব্যভিচার, গুন্ডামী এমন কি কথায় কথায় নরহত্যার প্রবণতাও জাগছে। তারা সততা, ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়েছে। ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা ও বড়দের প্রতি সম্মানবোধ বিলুপ্ত হচ্ছে। এগুলোকে তারা সেকেলে রেওয়াজ বলে মনে করছে। শিক্ষকদের অসম্মান করতে পারলে তারা গর্ব অনুভব করে। আরো বহু অসৎ কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এসব অসৎ কাজের অংশ তুমিও লাভ করছো।"

"তবু এরও তো একটা শেষ আছে, হে আল্লাহ?" কবির কণ্ঠ থেকে নিরাশা ঝরে পড়ছিল।

"না এর শেষ এখনো দেখা যাচ্ছে না," আল্লাহ বলে যেতে লাগলেন। "তুমি মরে গেছো। কিন্তু তোমার লেখা বেঁচে আছে। তোমার গল্পের বই আবার ছাপা হচ্ছে।

তোমার কবিতার বই আবার ছাপা হবে। তোমার লেখা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। তোমার লেখা বহু লোক পড়েছে। আরো বহু লোক পড়বে। বহুদিন ধরে পড়বে। দুনিয়ার কয়েকটি ভাষায় তোমার লেখার অনুবাদও চলছে। কাজেই তোমার লেখার সাহায্যে তুমি দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছো। তোমার লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে দুনিয়ার যেখানে যে অসৎ কাজটি হচ্ছে তার গোনাহর অংশ তোমার আমল নামায়ও লেখা হচ্ছে। আবার তোমার লেখার কথা একদিন মানুষ ভুলে গেলেও তোমারি সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ করে অনেক নতুন লেখক এগিয়ে আসবে। তাদের মাধ্যমে মানুষের অসৎ কাজ থেকে তুমি নিজের অংশ পেতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই তোমার শাস্তিও চলতে থাকবে।"

"তাহলে কি আমার কোন আশা নেই?" কবি কাঁদতে লাগলো।

"কোনো আশা নেই। তবে যদি তুমি লেখার সাহায্যে মানুষকে সৎপথে চালাতে তাহলে তার সুফলও এমনিভাবে পেতে। তুমি যদি ভালো ভালো কবিতা লিখতে। ভালো ভালো উপন্যাস নাটক রচনা করতে। তোমার কবিতা, উপন্যাস, নাটকে প্রভাবিত হয়ে যদি সমাজে সুকৃতির প্রচলন হতো এবং দুস্কৃতি নির্মূল হবার পথ তৈরি হতো তাহলে সুকৃতি প্রতিষ্ঠিত হতো এবং দুস্কৃতি খতম হয়ে যেতো। তোমার রচনায় প্রভাবিত হয়ে যে সব যুবক সমাজ পুণরগঠনের কাজে লিপ্ত হতো তারা যেপরিমাণ নেকী অর্জন করতো সেই পরিমাণ নেকী তোমার ভাগেও লেখা হতে থাকতো। তাহলে তোমার মর্যাদা আরো বেড়ে যেতে থাকতো। এটা কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তেই থাকতো। তোমার প্রতিভা ও ক্ষমতা ছিল অনেক বেশী। কিন্তু তুমি তার সদ্ব্যবহার করোনি। নফসের তাবেদারী করে নিজের খেয়াল খুশী মতো চলেছো। খেয়াল খুশী মতো লিখেছো। আমার অনুগত হয়ে তোমার কলম পরিচালনা করোনি। তুমি মানুষকে খুব বেশী গোমরাহ করেছো। তার সমস্ত ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে। নিজের দোষেই তুমি আজাব ভোগ করছো।"

কবির ওপর শাস্তি চলতে থাকলো পুরোদমে।

প্রশ্নের জবাব দাও

১. কবি ও সাহিত্যিক কাকে বলে?

২. সৎ কবি, সৎ লেখক ও সৎ সহিত্যিক কাকে বলে?

৩. অসৎ কবি ও অসৎ সাহিত্যিক কার তাবেদারী করে? কেমন করে?

৪. মানুষ শাস্তি ও আজাব ভোগ করে কার দোষে?

৫. সৎ সাহিত্যিক কিভাবে তার সৎকাজের পুরস্কার পাবে?

গোলাম হলো পুত্র

ইহুদী সাল্লাম বিন জুবাইর সেই সকাল থেকে বসে আছে ইয়াসরিবের বাজারে। তার সব মাল-সামান বিক্রি হয়ে গেছে। লাভও হয়েছে দেদার্ কিন্তু এই গোলাম বাচ্চাটা যেন তার গলায় কাঁটার মতো আটকে আছে। সেই সকাল থেকে এটার কাছেও কেউ ঘেঁসছে না। এই বাচ্চাটা না দু'পয়সা আয়-রোজগার করতে পারবে আর না করতে পারবে ঘরের কোনো কাজ-কাম, এ চিন্তাই বোধ হয় খদ্দেরদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

এসব সাতপাঁচ ভাবছিল সাল্লাম। এমন সময় আওস গোত্রের সুন্দরী যুবতী সাবিতা বিনতে ইয়ারিবের নজরে পড়লো এই ছোট্ট গোলামটি। সাবিতা বিড়বিড় করলোঃ ইস না জানি কার কলিজার টুকরো। বাচ্চাটাকে কিনে নেবার ইচ্ছে জাগলো তার মনে। জিজ্ঞেস করলোঃ

কি হে সাল্লাম! তোমার এ গোলামটার নাম কি?

বনি কালব গোত্রের যে ব্যক্তি একে আমার কাছে বিক্রি করেছে সে এর নাম বলেছিল সালেম।

এর বাপের নাম কি?

তাতো জানি না। তবে ঐ কালবি লোকটি বলেছিল, শিশুটি ভদ্র ও অভিজাত বংশের। আর এ নাকি ইসতাখার খান্দানের...... ।

হাঁ-হাঁ ঐ যে ইসতাখার খান্দান উবলায় বাস করতো। সারা ইরাকে এদের ব্যবসা ছড়িয়ে আছে। আচ্ছা এসব আমি ভালো করেই জানি। এখন আমি গোলামটাকে কিনতে চাই।

ভালো দামেই সাবিতা গোলামটাকে কিনে নিল। আয়-রোজগার করার জন্যে বা নিজের খেদমত করার জন্যে সে গোলামটাকে কিনেনি। আসলে শিশুটির প্রতি করুণা ও মমতার বশেই সে তাকে কিনে নিয়েছিল। পথে যেতে যেতে সে মনে মনে বিড়বিড় করছিল–

লা'নত! হাজার বার লা'নত! যারা মানুষের প্রতি রহম করেনা, দুর্বলের প্রতি করুণা করে না- তাদের ওপর লা'নত! যে মায়ের ছেলে হারিয়ে যায় আহ! তার কী কষ্ট! যে ছোট্ট শিশুটি এখনো মাকে চেনে না, বাপকে চেনে না, নিজের কোন আত্মীয় স্বজনের চেহারা যার চোখে ভাসে না, আহা সে কতবড় হতভাগা! আহ এ রকম যদি আমার কোন বাচ্চা হতো। ডাকাতরা যদি আমার ওপর হামলা করে তাকে লুট করে নিয়ে যেতো, তাহলে আমার দশাটা কেমন হতো! এ অবস্থায় আমি কেমন করে বেঁচে থাকতাম। জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কি আমি নিজের বাচ্চাটির কথা ভুলতে পারতাম? কখনোই না। দুনিয়ায় বেঁচে থাকাই তো আমার জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়তো। দুনিয়ার সব নিয়ামত আমার ওপর হারাম হয়ে যেতো।

সাবিতা নিজের মনের আয়নায় যেন বাচ্চার মাকে দেখতে পাচ্ছিল। সে ভাবছিল কিসরার সৈন্যরা যখন একে লুটেরাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি তখন এই ইয়াসরিবে একে

কিভাবে রক্ষা করবো? এ শহরে তো আগে থেকেই বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে আছে। তার ওপর ইহুদী ও বদ্দুরা একে ঘিরে আছে চারদিক থেকে।

এ ঘটনার পর সাবিতার বিয়ের পয়গাম এলো আওস ও খাযরাজদের বড় বড় ঘর থেকে। কিন্তু সে এখন বিয়ে করতে রাজি ছিল না। নানান অজুহাত দেখিয়ে বিয়ে এড়িয়ে গেলো। ছোট্ট সালেমকে নিয়েই সে মেতে রইলো। এর এক বছর পরে কুরাইশদের একটি কাফেলা সিরিয়া থেকে ফেরার পথে ইয়াসরিবে কয়েক দিন বিশ্রাম নিল। এই কাফেলায় ছিলেন আবু হুযাইফা হাইসাম বিন উতবাহ। সাবিতার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছিলেন আবু হুযাইফা। আর তার গোলামটির কথাও। লোকের মুখে মেয়েটির অসম্ভব গুণপনার কথা শুনে আবু হুযাইফা বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন সাবিতার কাছে। সাবিতা প্রথমে কানই দেয়নি। কিন্তু পরে শুনলো কুরাইশ বংশে আবু হুযাইফার মর্যাদার কথা। এমন এক কাবাগৃহের তারা খাদেম যে গৃহের ওপর আক্রমণকারী হস্তী সেনাদলকে আল্লাহ আবাবিল পাখি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সাবিতা বিয়েতে রাজী হয়ে গেলো।

বিয়ের পর আবু হুযাইফা স্ত্রী ও গোলামটিকে সাথে নিয়ে মক্কায় চলে এলেন। আবু হুযাইফা ছিলেন জোয়ান। কুরাইশদের বিভিন্ন আসরে তাঁকে দেখা যেতো সব সময় সরগরম।

কিন্তু এবারের মজলিস তেমন জমছিল না। কোথাও যেন কিছু ঘটে গেছে বলে তাঁর মনে হচ্ছিল। এবারের মজলিসগুলো যেন কিছুটা প্রাণহীন। যেন কিসের অভাব। তিনি একটু গম্ভীরভাবে ভেবে দেখলেন। তাইতো এখানে উসমান বিন আফফানকে দেখি না তো। তালহা বিন উবায়দুল্লাহ তামিমী কোথায়? অমুক বন্ধু, অমুক দোস্ত, কই তাদের দেখছি না তো? তারা কোথায়? তারা কেন আসে না? যাকে জিজ্ঞেস করেন আবু হুযাইফা সেই চুপ করে থাকে। কেউ কেউ জবাব দিলেও তা ইংগিতপূর্ণ, বুঝে ওঠা মুশকিল।

বন্ধুদের খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে শেষে ভাবলেন তারা তো এই শহরেই থাকে, আচ্ছা তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি না কেন? প্রথমে গেলেন উসমানের বাড়িতে। উসমানের বয়স চল্লিশ। তাঁর চেয়ে দশ বছর বেশী। কিন্তু তাঁর প্রাণের দোস্ত। সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন তাঁকে। যেমন রুচিশীল, তেমনি জ্ঞানী, তেমনি আবার মধুর স্বভাবের।

বাড়িতেই পেলেন উসমানকে। উসমান তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। হাসি মুখে বললেন, কেমন আছো আবু হুযাইফা?

আবু হুযাইফা নিজের মনের প্রশ্নের জবাব খুঁজছিলেন। কোথায় কিসের যেন পরিবর্তন উসমানের চেহারার মধ্যে তিনি পেলেন। আগের চাইতেও উসমানকে যেন আরো বেশী গম্ভীর, আরো বেশী সহনশীল মনে হচ্ছে।

"উসমান! তোমাকে আমি মক্কার সব আসরে খুঁজে বেড়িয়েছি। সিরিয়া থেকে বাণিজ্য কাফেলা ফিরে আসার পর থেকেই তোমাকে খুঁজে ফিরছি। বলতো, তোমার কি হয়েছে? তুমি কেন মজলিসে যাওয়া ছেড়ে দিলে?"

"এ মজলিস আমার একদম পছন্দ নয়। ওখানকার আলোচনাগুলোও একেবারে বাজে।"

"ব্যাপার কি? তোমার কওম কি তোমাকে কোনো কষ্ট দিয়েছে?"

উসমান চুপ করে থাকলেন। কোনো কথা বললেন না।

"তাহলে উসমান! কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে। তোমাকে লাত ও উযযার কসম....।"

লাত ও উযযার নাম শুনতেই আবু হুযাইফা দেখলেন, বন্ধুর কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে। মুখে বিরক্তি। চোখে ক্রোধের ছায়া। এমন তো তিনি আগে কখনো দেখননি। তিনি থেমে গেলেন। এবার কথা ঘুরিয়ে নিলেন।

"উসমান! তোমার সাথে আমার কতকালের দোস্তি। তুমি আমার প্রাণের দোস্ত। তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করি। তোমার সাথে এতদিনের বন্ধুত্বের দোহাই, বলো, বলো, তোমার প্রাণে কিসের ব্যথা? তোমার মনের কথা বলো।"

উসমান অত্যন্ত ঠান্ডা মেজাজে কোমল ভাষায় বললেন ঃ "দেখো আবু হুযাইফা, আমাদের বন্ধুত্ব যদি টিকিয়ে রাখতে চাও তাহলে তোমার ঐসব দেবতাদের লাত ও উয্যার দোহাই দিতে পারবে না আমার কাছে, যারা আসলে কোন ক্ষমতাই রাখে না।" আবু হুযাইফা তো অবাক! বলে কি উসমান! প্রথমে তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তারপর বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন, "উসমান! তাহলে তো মনে হচ্ছে তুমি বিধর্মী হয়ে গেছো।" "না...না... আবু হুযাইফা আমি বিধর্মী হয়ে যাইনি বরং আমি সত্য ধর্মের সন্ধান পেয়ে গেছি। আবু হুযাইফা, তুমি তো একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার বয়স তেমন বেশী না হলেও তুমি তো দুনিয়ার অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছো। অনেক দেশ দেখেছো। অনেক জাতির কথা শুনেছো। দেশে দেশে জাতির মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখেছো। কালের যুগের অনেক ভাঙ্গাগড়ার ঘটনা তোমার সামনে আছে। তা থেকে অনেক জ্ঞান, অনেক অভিজ্ঞতা তুমি সঞ্চয় করেছো। আচ্ছা তুমি বলো, তোমার মতো বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা কেমন করে এই সব কাঠের তৈরী, ইট-পাথর ও মাটির তৈরী মুর্তিগুলোর পূজা করতে পারে? এগুলোকে তো আমার তোমার মতো মানুষেরাই বানিয়েছে। আবার যে কেউ চাইলে এগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলতেও পারে।"

সত্যিই আবু হুযাইফা চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বললেন ঃ

"উসমান! তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে। এমন করে তো কোনদিন ভেবে দেখিনি। সত্যিই অবাক হচ্ছি, তুমি যা বলছো তা একশো ভাগ সত্যি। আশ্চর্যের ব্যাপার, আজ পর্যন্ত এ

কথাটা একবারও মনে জাগেনি। বাপ-দাদারা ওই মুর্তিগুলোকে পূজা করে আসছে। তাদের দেখাদেখি আমরাও পূজায় যোগ দিয়েছি।"

"তাহলে এখন তো সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে? এখন তো জানলে? কি করবে এখন? "আমাকে নিয়ে চলো সেখানে যেখান থেকে তোমরা পেয়েছো এই সত্যের আলো।"

"কবে যাবে?"

"আজ, এখনই।"

বিকেলে সন্ধ্যে হবার আগেই আবু হুযাইফা ইসলাম গ্রহণ করলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে। মুসলমান হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। প্রিয়তমা স্ত্রী সাবিতা শুনলেন সব কথা স্বামীর মুখ থেকে। কী অনাবিল আনন্দে উদভাসিত তার স্বামীর হৃদয়! সাবিতা সহজেই এটা অনুভব করতে সক্ষম হলেন। এই আনন্দের সন্ধানই তো তিনি করে ফিরছেন গত কয়েক বছর ধরে। সাবিতা ঈমান আনলেন আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। তাঁদের গোলাম সালেমের মনও স্বামী স্ত্রীর কথাবার্তা শুনে সত্যের ডাকে সাড়া দিল। সেও ঈমান আনলো। এভাবে সেদিন রাত হবার আগে আগেই মক্কায় মুসলিম ঘরানার সংখ্যা আরো একটি বেড়ে গেলো।

কিছুদিন পরে সাবিতা শুনলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভের সুখবর শুনাচ্ছেন তাদের যারা গোলাম আযাদ করে দিচ্ছে। তখনি তিনি তার ইরানী গোলামকে ডেকে বললেন ঃ

"সালেম! আজ থেকে তুমি মুক্ত স্বাধীন। এখন তুমি যাকে ইচছা তাকে নিজের অভিভাবক বানাতে পারো।"

"সালেম আবু হোযাইফাকে বললো ঃ "আপনি কি আমার অভিভাবক হবেন?"

আবু হোযাইফা বললেন ঃ "না, হে খোকা। আমি তোমার অভিভাবক হতে যাবো কেন? তুমি তো আজ থেকে আমার ছেলে।"

হাদীস অবলম্বনে গল্পটি রচিত

প্রশ্নের জবাব দাও

১. সাবিতা আবু হুযাইফার বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হলো কেন?
২. লাত ও উযযার কসম শুনে উসমানের কপালে ভাঁজ পড়লো কেন?
৩. সত্যের আলো এনেছেন কে?
৪. সাবিতার আনন্দ কিসে?
৫. সালেম গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করলো কিভাবে?

আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন

হঠাৎ মরিয়মের ঘুম ভেঙ্গে যায়। এত রাতে কিসের আওয়াজ! চারদিক নিরব বিস্তব্ধ। শুধু একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। আবার সেই আওয়াজ। আওয়াজটা অবশ্য খুব আস্তে ধীরে। তবুও তার বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না কোন কিছুর ওপর লোহা দিয়ে পিটানো হচ্ছে। কিন্তু এত রাতে কে পিটাচ্ছে? কি পিটাচ্ছে?

মরিয়মের কৌতুহল ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আওয়াজটা মনে হয় পাশের কোন কামরা থেকে আসছে। সে ওঠে। পাশে শুয়ে আছে তার নতুন ভাইটি। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন যেন কোন অচীন দেশের রাজ কুমার। মাত্র তিন মাস হলো তার এই নতুন ভাইটি তাদের ছোট্ট ঘরখানা আলো করেছে। কচি মুখখানি নিবিড় মমতায় ভরা।

কিন্তু ভাইয়ের চিন্তা রেখে সে এখন নিশুতি রাতের আওয়াজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। পাশের ঘরের দরজা খুলতেই দেখে তার আম্মিজান একটি কাঠের বাক্স তৈরী করছেন।
"আম্মি। এত রাতে...."

"চুপ" আম্মি ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দেন, "আস্তে কথা বলো।"

"আম্মিজান! এই দুপুর রাতে বসে বসে আপনি এ কি বানাচ্ছেন।"

আম্মি বাক্স তৈরীতে মশগুল ছিলেন। আরেকটা পেরেকের মাথায় আস্তে করে কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে মেয়ের কানে কানে বলেন, "ভাইয়া ঘুমুচ্ছে না? তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

"হাঁ ঘুমুচ্ছে তো।"
"যাও তাকে নিয়ে এসো। যেন ঘুম ভেঙ্গে না যায়।"
"কেন আম্মি? সে তো খুব আরামে ঘুমুচ্ছে।"

"যাও, ভালো মেয়ের মতো যা বলি শোনো। হাঁ, তবে সাবধান, যেন ঘুম ভেঙ্গে না যায়।" আম্মি আবার চুপি চুপি বলেন।

মেয়ে মায়ের আদেশ পালন করে। সে গিয়ে কচি একরত্তি ভাইটিকে আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠায়। ক্ষুদে রাজকুমারটি তখনো গভীর ঘুমে অচেতন। সে তাকে মায়ের কাছে আনে। মায়ের হাতে তুলে দেয়। মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। নরোম তুলতুলে গালটায় আলতোভাবে একটা চুমো খান। তারপর বাক্সের ঢাকনাটা খুলে তার মধ্যে ছেলেকে শুইয়ে দেন। এবার ঢাকনাটা বন্ধ করতে থাকেন।

"হায়, হায়, আম্মি! এ আপনি কি করেন? ভাইয়া যে দম আটকে মারা যাবে।" বলতে বলতে ভীত-বিহবল মেয়ে মায়ের হাত টেনে ধরে।

"চুপ করো, চিৎকার করোনা। সবর কর মরিয়ম। এটাই আল্লাহর হুকুম।" একথা বলতে বলতে মা বাক্সের ঢাকনাটা বন্ধ করে দেন। মরিয়ম অবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখতে থাকে। তার মা মোম দিয়ে বাক্সের চারদিক বন্ধ করে দেন। ঢাকনায় কয়েকটা ছোট ছোট ফুটো ছিল। মরিয়ম ভাবতে থাকে বোধ হয় বাতাস যাওয়া-আসা করার জন্য এই ফুটোগুলো রাখা হয়েছে। তাহলে তার ভাইয়া মারা যাবে না। এর মধ্যে ঘুমিয়ে থাকবে। মরিয়ম বুঝতে পারে না তার আম্মি কি চান। ভাইয়াকে বাক্সে ভরে কি করবেন? পরক্ষণে মনে পড়ে, আম্মি বলেছেন, এটাই আল্লাহর হুকুম।

মরিয়ম এতক্ষণ চিন্তায় ডুবে ছিল। হঠাৎ দেখে তার আম্মি বাক্সটি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ধীর পদক্ষেপে দরজার দিকে চলেছেন। মরিয়ম মার পেছনে পেছনে চলতে থাকে। আহা! কি আনন্দেই না সে ছোট্ট ফুটফুটে ভাইটিকে নিয়ে খেলা করছিল। কিন্তু আর সে ভাইয়ার সাথে খেলতে পারবে না। আজ না জানি আম্মি ভাইটিকে বক্সে ভরে নিয়ে কোথায় চলেছেন। কিছু জিজ্ঞেস করলে ভালো করে বলেও না। মরিয়মের মন বিষিয়ে ওঠে। তার মনে ইচ্ছা জাগে, সে মায়ের কাছ থেকে বাক্সটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে বনের মধ্যে। একদম গভীর বনের মধ্যে। সেখানে কোন মানুষের হিংস্র দৃষ্টি পৌঁছুতে পারবে না কোন দিন। শুধু সে আর তার কচি ভাইটি মনের সুখে খেলা করবে সেখানে। প্রিয় ভাইটিকে সে শুধু আদর করবে। গাছ থেকে ফল পেড়ে এনে নিজে খাবে আর কচি ভাইটিকে খাওয়াবে মিষ্টি মধুর ফলের রস। কেউ তার ভাইয়াকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সে এগিয়ে গিয়ে মায়ের কাপড় টেনে ধরে।

"আম্মি! আমার আম্মি!......"

"চুপ, মরিয়ম, চুপ করো? ...."

"হায়! হায়! আম্মি আপনি ভাইয়াকে ...."

"চুপ করো, একদম চুপি চুপি বেরিয়ে যেতে হবে এই পাড়া থেকে, তারপর যেখানে লোকজন নেই......."

"এই দুপুর রাতে যেখানে লোকজন নেই? ......"

"হাঁ, হাঁ, চুপ করো, নিরবে হেঁটে চলো। নাহলে তোমার ভাইয়ার ক্ষতি হবে।"

মরিয়ম এবার একদম চুপ হয়ে যায়। লোকালয়ের বাইরে আসতেই সে আর একদণ্ড চুপ থাকতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, "আম্মি! আমার আম্মি! এবার বলেন ভাইয়াকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?"

"তোমার ভাইয়াকে নীল নদে ভাসিয়ে দেবো।"

"হায়, হায়, আম্মি! আপনি এ কি কথা বললেন? তাহলে ভাইয়া বাঁচবে কেমন করে? কে তাকে দুধ খাওয়াবে? আমার ভাইয়া যে কেঁদে কেঁদে মারা যাবে। আর নীলের কিনারায় যেসব জন্তু জানোয়ার আছে তারা তাকে খেয়ে ফেলবে। হায়, আমার আম্মি! আপনি কেন এমন কাজ করতে যাচ্ছেন? আপনার দিলে কি একটুও দয়ামায়া নেই? আপনার কলিজার টুকরোকে আপনি এভাবে জন্তু-জানোয়ারের মুখে ছেড়ে দিচ্ছেন? আম্মি! আপনি না পারেন ভাইয়াকে আমার হাতে দিয়ে দিন। আমি তাকে নিয়ে গভীর বনে চলে যাবো। সেখানে কেউ আমাদের নাগাল পাবে না। বাদশাহ ফেরাউনের গুপ্তচরেরা হাজার চেষ্টা করেও আমাদের সন্ধান পাবে না।"

মরিয়ম মায়ের পথ আগলে দাঁড়ায়। বাক্সের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

"না, মরিয়ম না, আমার পথে বাধা দিয়ো না। সবর করো। এটাই আল্লাহর হুকুম। নিশ্চিন্ত থাকো, আল্লাহ তোমার ভাইয়াকে রক্ষা করবেন।"

"এটাই আল্লাহর হুকুম? সত্যি, এটাই আল্লাহর হুকুম?

"হাঁ, মরিয়ম......"

"আহ! আ-ল্লা-হ..! তুমি আমার ভাইয়াকে রক্ষা করো।"

মরিয়ম চোখের পানি মুছতে থাকে। মায়ের পেছনে পেছনে নিরবে চলতে থাকে সে। এখন তারা নীলের কিনারে পৌঁছে গিয়েছে। বর্ষার নীল পানিতে টইটুম্বুর। ছলাৎ ছলাৎ করে বড় ঢেউগুলো এসে কিনারায় আছড়ে পড়ছে। পানির স্রোতও প্রবল।

মা এতক্ষণে কাঁধ থেকে কাঠের বাক্সটি নামান। নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে বাক্সটি ভাসাতে যাবেন এমন সময় মেয়ে মায়ের হাত টেনে ধরে।

"আম্মি পানির তোড় দেখছেন না? বাক্সটি এখনি তলিয়ে যাবে।"

তা ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এটাই আল্লাহর হুকুম।"

মা বাক্সটি পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে বড়ই নিশ্চিন্তে একটা শ্বাস ফেলেন।

বলতে থাকেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার হুকুম পালন করেছি। তোমার হুকুম এক চুলও অমান্য করিনি। হে আল্লাহ! হে রব্বুল আলামীন! আমার সব ভুল-ত্রুটি সব গুনাহ মাফ করে দিয়ো। হে পরওয়ারদিগার! তোমার আমানত তোমারই হাওয়ালা করে দিয়েছি। মেয়েকে বলেন ঃ "যাও নীলের কিনারে দেখতে দেখতে যাও। দেখো আল্লাহ তার বান্দাকে কিভাবে রক্ষা করেন।"

একথা বলে মা ঘরের পথ ধরেন। মরিয়ম তার ভাইয়ার বাক্সটির ওপর নজর রেখে নীলের কিনারা ধরে হাঁটতে থাকে। কোন বড় ঢেউ এসে যখন বাক্সের গায়ে আছড়ে

পড়ে এবং বাক্সটি ঢেউয়ের মাথায় একটি মোচার খোলার মতো ওঠানামা করতে থাকে তখন ভয়ে মরিয়মের মুখ থেকে বের হয়ে পড়েঃ "হে আল্লাহ! এবার বুঝি সব শেষ।" সে বাক্সটি নজরে রেখে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলতে থাকে আর চলতে থাকে। কখনো ঢেউয়ের ধাক্কায় বাক্সটি একেবারে নদীর কিনারে চলে আসে। তার মন চায় বাক্সটি তুলে নিয়ে একেবারে বনের গভীরে চলে যায়। কিন্তু আবার মায়ের সেই কথাই মনে পড়ে, "এটাই আল্লাহর হুকুম। দেখো, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কিভাবে রক্ষা করেন।"

সে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে পূর্ব দিক ফর্সা হয়ে আসে। ধীরে ধীরে সূর্য উঠে দুনিয়ার সব আঁধার দূর করে দেয়। এমন সময় হঠাৎ সামনে পড়ে একটি বিরাট প্রাসাদ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে একেবারে নদীর কিনারা ঘেঁষে এর অবস্থান। নদীর কিনার ধরে সামনে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সে ভাবে, এবার কি হবে? বাক্সের অনুসরণ করাতো আর সম্ভব হচ্ছে না। প্রাসাদ ঘুরে নদীর কিনারে আসতে আসতে বাক্স অনেক দূর চলে যাবে। এখন কি করা যায়। সে এসব সাত-পাঁচ ভাবছিল এমন সময় দেখে নদীর দিকে প্রাসাদের একটি দরজা খুলে গেছে। মূল্যবান পোশাকে সজ্জিতা অনেকগুলো মেয়ে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে একজন যে সবচাইতে মূল্যবান পোশাকে সজ্জিতা এবং যাঁকে সবচেয়ে সম্মানিতা ও প্রাসাদের কর্ত্রী বলে মনে হয়, তিনি হাত বাড়িয়ে নদীতে বাক্সটির দিকে দেখান। তিনি পাশে দাঁড়ানো একজনকে কি যেন বলেন। তারপর সে দেখে জাল নিয়ে একদল জেলের আবির্ভাব। মুহূর্তের মধ্যে তারা বাক্সটি জালে আটকে ফেলে প্রসাদের দিকে নিয়ে চলে। মরিয়ম দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সেও জেলেদের পেছনে পেছনে চলে। জেলেদের সাথে সাথে সে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে। জেলেরা বাক্সটিকে সেই সুসজ্জিতা ও সম্মানিতা মহিলার হাতে সোপর্দ করে নিজেদের পারিশ্রমিক ও পুরস্কার নিয়ে চলে যায়। মরিয়ম দাঁড়িয়ে থাকে। সে দেখতে পায় সম্মানিতা মহিলা বাক্সটির ডালা উঠিয়ে ফেলেছেন। বাক্স খুলতেই মহিলার চোখে মুখে বিস্ময় দেখা দেয়। তার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, "শিশু"।

মরিয়মের বুক দুরু দুরু করতে থাকে। সে প্রাসাদ কর্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে থাকে। তার পা কাঁপতে থাকে। মনে হয় ভাইয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে এখনই সে এক ছুটে প্রাসাদের বাইরে চলে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তার কানে আওয়াজ ভেসে আসেঃ "দেখো, আল্লাহ্ তার বান্দাকে কিভাবে রক্ষা করেন।" সে নিজের বুকে হাত চেপে ধরে।

প্রাসাদ কর্ত্রী বাক্স থেকে শিশুটি বেরে করেন। দুহাতের ওপর রেখে তাকে উঁচু করে ধরেন। নিজের ভাইয়াকে জীবিত অবস্থায় আঙ্গুল চুষতে দেখে মরিয়মের আনন্দের সীমা থাকে না। সে চুপচাপ দেখতে থাকে।

প্রাসাদ কর্ত্রী ফুটফুটে শিশুটিকে নিজের মুখের কাছে তুলে আনেন। অসীম মমতায়, মাতৃত্বের গভীর আবেগে আপনা আপনি তার মুখ নেমে যায় শিশুর ঠোঁটের ওপর। তাকে চুমো খান। আদর করেন। তার পাশে দাঁড়ানো দাসীদের হুকুম দেনঃ "এখনি চলে যাও, নগরের সবচেয়ে ভদ্র, অভিজাত, সুন্দরী, যুবতী দাইকে এখানে হাজির করো।"

ব্যাস, শুধু যেন হুকুমেরই অপেক্ষায় ছিল সবাই। তারপর দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে একের পর এক দাই আসতে থাকে। তারা শিশুকে দুধ পান করাতে চায়। কিন্তু শিশু যেন মুখ বন্ধ করে আছে। মুখ খোলেই না। বিপুল পুরস্কার আর বৃত্তির লোভে অনেকে অনেক রকম কায়দা কসরত চালায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। মরিয়ম এসব দেখতে থাকে। হঠাৎ সে এগিয়ে এসে প্রাসাদ কর্ত্রীর সমানে দাঁড়ায়। সে গভীর প্রত্যয় সহকারে বলে ঃ

"যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমি এমন এক দাইকে হাজির করতে পারি, যার দুধ এই শিশু খাবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।"

"যাও, এখনই চলে যাও। তাকে নিয়ে এসো।"

মরিয়ম একছুটে প্রাসাদ থেকে বের হয়। তার খুশীর আর অন্ত নেই। মহান ও অসীম ক্ষমতাশালী আল্লাহর প্রশংসা করার ভাষা তার ছিল না। সারাটা পথ যেন সে বাতাসে উড়ে আসে। কোন পাথরে ঠোকর লেগে তার পায়ের নখ ফেটে গেছে, শরীরের কোথাও মারাত্মক আঘাত লেগেছে অথবা পথের পাশের কাঁটাগাছের ঘষা লেগে তার পায়ের চামড়া কোথাও ছিঁড়ে গেছে- এসব সে কোনো রকম টেরই পায়নি। কোনো এক দুর্বার আকর্ষণ, কোন এক অপরিসীম মোহ যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

"আম্মি..... আম্মি..."

মা যেন এই ডাকের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি যেন তৈরী হয়েই বসে ছিলেন। "এই যে মরিয়ম বাছা আমার," বলে তিনি লাফিয়ে মেয়ের সামনে আসেন। তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ঘরের এক কোণে তাকে টেনে নিয়ে যান।

মরিয়ম বলে চলে, "আম্মিজান, আল্লাহ তার বান্দাকে রক্ষা করেছেন।"

মেয়ে মায়ের চোখের দিকে তাকায়। তার আম্মি কি চিন্তিত? কই না তো, চিন্তার লেশমাত্র তাঁর চোখের কোণায় দেখা যাচ্ছে না। আশংকার কোন ছাপ নেই সেখানে। আল্লাহর হুকুমের ওপর কী অটল বিশ্বাস! এজন্যেই তো সে তার আম্মিকে এতো ভালবাসে। মা মেয়ের মনের কথা টের পায়। বলেন, মরিয়ম, আল্লাহর হুকুমে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। আমি জানতাম আল্লাহ আমার ছেলেকে রক্ষা করবেন। জালেম বাদশাহ ফেরাউনের জল্লাদের হাত থেকে আমার ছেলেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আল্লাহ ফেরাউনের প্রাসাদেই তার বাঁচার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর অসীম দয়া। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর দুচোখ পানিতে ভরে গেলো।

মরিয়ম বলে উঠলো "আম্মি, তাহলে চলেন রাজপ্রাসাদে। ভাইয়া যে আপনার দুধ ছাড়া আর কারোর দুধ খাবে না।"

কাপড়ের পোটলা একটা বগলে নিয়ে মা ও মেয়ে বেরিয়ে পড়ে। যখন তারা রাজ প্রাসাদে পৌঁছুলো তখন ভীড় আরো বেড়ে গেছে। প্রাসাদকর্ত্রীর মুখে দস্তুরমতো হতাশার ছায়া পড়েছে। অত্যন্ত বিমর্ষ মনে হচ্ছিল তাঁকে। ওদের দেখেই বলে উঠলো। "এই যে মেয়ে, তুমি না বলেছিলে ভাল দাই আনবে?"

"এই যে এনেছি বেগম সাহেবা।"

মরিয়ম তার আম্মিকে এগিয়ে দেয়। আম্মি এগিয়ে যান। মনে মনে আল্লাহর শোকর আদায় করেন। ছেলেকে কোলে তুলে নেন। ততক্ষণে শিশু মায়ের কোলে উঠে চুক্ চুক্ করে দুধ খেতে শুরু করেছে।

কুরআনে বর্ণিত মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

প্রশ্নের জবাব দাও

১. মরিয়মের মা শিশুপুত্রকে বাক্সবন্ধী করে নীলের পানিতে ভাসিয়ে দেন কেন? কার ভয়ে? শিশুর বয়স ছিল কত?
২. কে বাক্সটি উঠিয়ে নেয়? কিভাবে উঠিয়ে নেয়?
৩. আল্লাহ ফেরাউনের জল্লাদের হাত থেকে কিভাবে শিশুকে রক্ষা করেন?
৪. ফেরাউনের হুকুমটি কি ছিল?
৫. শিশু কিভাবে তার মায়ের কোলে ফিরে এলো?

হযরত লোকমানের নসীহত

আমরা অনেক জ্ঞানীর কথা জানি। জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান লোকেরা তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁরা বড় বড় বই লিখেছেন। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কার করেছেন। নানা ধরনের মেশিন-কলকব্জা তাঁদের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ। বেতার, টেলিভিশন, বিজলী, রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, নৌযান ইত্যাদি তৈরী করে তাঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার কথা অস্বীকার করবে দুনিয়ায় এমন একজন লোকও নেই।

কিন্তু যাঁরা বুদ্ধি খাটিয়ে বড় বড় মেশিন তৈরী করেছেন এবং সেগুলোকে কাজে লাগাবার পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন তাঁরা যদি এই এত বড় বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও পরিচালককে চিনতে না পারেন, দুনিয়ায় ও আকাশে তাঁর কর্মকুশলতা দেখতে না পান, তাহলে তাঁদের বুদ্ধিকে আমরা কি বলে অভিহিত করবো? তাঁরা কি সত্যি বুদ্ধিকে ঠিক মত ব্যবহার করছেন? তাঁরা এত কথা চিন্তা করেন, এত বড় বড় জিনিস আবিস্কার করেন কিন্তু একবারও ভেবে দেখেন না তাঁরা নিজেরা কোথা থেকে এসেছেন? কেন এসেছেন? এ বিশ্ব জাহান কে সৃষ্টি করেছেন? তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি?

হযরত লোকমান ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী পুরুষ। আল্লাহ তাঁকে সত্যকে জানার জ্ঞান দিয়েছিলেন। মানুষের মধ্যে সেই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী যে তার সৃষ্টিকর্তা ও প্রকৃত মালিক আল্লাহকে চিনতে পারে। হযরত লোকমান তাঁর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক আল্লাহকে চিনতেন। তিনি জানতেন বিশ্ব জগতের সমস্ত জিনিস কে তৈরী করেছেন। কে তিনি যিনি মানুষকে এ অপার নিয়ামত দান করেছেন। আবার তিনি এই দয়াময় মহান প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা কিভাবে প্রকাশ করতে হয় তাও জানতেন।

হযরত লোকমান ছিলেন বড়ই নেকবখত ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর কথা বলেছেন। অনেকে তো এমন কথাও বলেছেন যে, হযরত লোকমান ছিলেন আল্লাহর নবী এবং হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের আত্মীয়। আবার অনেকে বলেন, তিনি আল্লাহর নবী নন তবে তাঁর সময়ের অনেক বড় জ্ঞানী, পন্ডিত ও সৎ লোক। সে যাই হোক তিনি নবী না হলেও ছিলেন তো একজন মস্ত বড় বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সৎ লোক। আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ আমি লোকমানকে দিয়েছিলাম জ্ঞান। উদ্দেশ্য ছিল, এর সাহায্যে সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

জ্ঞান আল্লাহর একটি নিয়ামত। এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের একটাই পদ্ধতি। যেহেতু এ নিয়ামত আল্লাহ দান করেছেন তাই এজন্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হলে তার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, তাঁর নিয়ামত এমনভাবে ব্যবহার করা যাবে না যাতে তিনি নারাজ হন। তিনি যে সব নিয়ামত দান করেছেন সেগুলো তাঁর দেয়া নিয়ম অনুযায়ী তাঁর হুকুমমতো এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে ব্যবহার করতে হবে।

সাধারণত আমরা কারোর কোনো দানের বিনিময়ে তার প্রতি কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করি। এতে তার কিছু লাভও হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর নিয়ামতের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তাতে আমাদেরই লাভ হয়, আল্লাহর কোনো লাভ হয় না। আল্লাহর সত্তা এ ধরনের কোনো লাভ ও লোকসানের অনেক উর্ধে।

সন্তানও আল্লাহর একটি নিয়ামত। এ নিয়ামতের জন্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। আর স্বাভাবিকভাবেই এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি হবে এই যে, মানুষ তার সন্তানকে এমনভাবে লালন পালন করবে যার ফলে সে বড় হয়ে আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দায় পরিণত হয়। সে হয় একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ। হযরত লোকমানকেও আল্লাহ সন্তান দান করেছিলেন। তিনি এ নিয়ামতের জন্যে কিভাবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন কুরআনে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত লোকমান প্রথমেই অত্যন্ত স্নেহ ও মমতা সহকারে তাঁর ছেলেকে বললেন ঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! আমার, তোমার এবং এ সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রভু যে আল্লাহ তাঁর কোনো শরীক, সাথী ও সহযোগী নেই। তিনি একা। তাঁর মতো বা তাঁর সমান কেউ নেই। তাঁর কোনো পিতা নেই এবং তিনিও কারোর পিতা নন। তিনি এমন সব গুণের অধিকারী যা আর কারোর নেই। যেমন, তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছু দেখতে পান। এটা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যেমন সব কিছু শুনতে পান অন্য কারোর সে ক্ষমতা নেই। মনের গোপন চিন্তা, গোপন কথা ও গোপন অভিসন্ধি একমাত্র তিনিই জানতে পারেন, অন্য কেউ এর কোনো কল্পনাই করতে পারে না।

তাঁর অধিকারেও কেউ তাঁর শরীক নেই। মানুষ তাঁর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়াবে এবং তাঁর বন্দেগী করবে, এটা তাঁর অধিকার। তাঁর অধিকার হচ্ছে, মানুষ তাঁর হুকুম মেনে চলবে এবং তাঁর কাছে নজরানা ও মানত পেশ করবে। হুকুম দেয়া ও দুনিয়ায় মানুষের চলার জন্যে আইন রচনা করা তাঁর অধিকার। এসব অধিকার ভোগ করার মতো তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো সত্তা নেই।

ক্ষমতায়ও আল্লাহর সাথে কেউ শরীক নেই। জীবন-মৃত্যু তাঁর হাতে। মানুষের প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন ও ফরিয়াদ তিনি শোনেন। ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি সব তাঁর আয়ত্বে রয়েছে। তিনিই কাউকে সফলতা দান করেন আবার কাউকে ব্যর্থ করে দেন। এ ক্ষমতার ছিটেফোঁটাও অন্য কারোর আয়ত্বে নেই।

হযরত লোকমান বলেন ঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করাই হচ্ছে এ দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় জুলুম। মানুষের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে তার নিজের ও এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও চিনতে হবে এবং তাঁর হুকুম মেনে চলতে হবে।

আল্লাহর হুকুম মানা ও তাঁর বন্দেগীর পর মানুষের জন্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাপ-মায়ের অধিকার। আল্লাহর অধিকারের পর মানুষের জন্যে বাপ-মায়ের অধিকারের চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো জিনিস নেই। কুরআন মজীদে হযরত লোকমানের নসীহতের আলোচনার মাঝখানে আল্লাহ বাপ-মায়ের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ "মানুষকে তার বাপ-মায়ের অধিকারের প্রতি নজর রাখার জন্যে আমি কঠোরভাবে তাকিদ করেছি। কেমন বিপদ

মাথায় নিয়ে তার মা তাকে লালন পালন করেছে। কতদিন পর্যন্ত সে তাকে নিজের পেটের মধ্যে রেখেছে এবং বিপদের পর বিপদের মুখোমুখি হয়ে নির্দিষ্ট সময়কাল পূর্ণ করেছে। তারপর দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করিয়েছে।"

হযরত লোকমানের নসীহতের মাঝখানে আল্লাহ আরো কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে উপদেশ দেন। তারপর আবার হযরত লোকমানের নসীহত শুরু হয়ে যায়। এ পর্যায়ে তিনি বলেন ঃ "হে আমার প্রিয় পুত্র! আল্লাহর জ্ঞান বড়ই সুদূর প্রসারী। যদি কোনো জিনিস হয় সরিষার দানার সমান এবং লুকিয়ে থাকে কোনো কঠিন পাথরের বুকে অথবা সুদূর মহাশূন্যে আকাশের নীলিমায় কোথাও তা উড়ে চলে যায় কিংবা মাটির বুকে কোথাও তাকে প্রোথিত রাখা হয়, তাহলে তা আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে যেতে পারে না। আল্লাহ যখনই চাইবেন তাকে নিজের সামনে হাজির করতে পারবেন। তাঁর জ্ঞান বড়ই ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি সব খবর রাখেন, সব কিছু দেখেন, সব কিছু শোনেন এবং সব জিনিস খুব ভালোভাবে জানেন।"

আল্লাহর এ গুণাবলীকে হযরত লোকমান এজন্যে পরিস্কার করে তাঁর ছেলের সামনে তুলে ধরেন যে, এগুলো সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা না থাকলে আল্লাহর মূল সত্তা সম্পর্কেও সঠিক ধারণা সৃষ্টি হবে না। ফলে আল্লাহর প্রতি ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না।

আল্লাহর গুণাবলীর কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর এবার হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে বলেছেন নামায পড়ার জন্যে। তিনি বলেন ঃ "হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি নামায কায়েম করো।" নামায এমন একটি কাজ যা মানুষকে আল্লাহর পথে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে। আল্লাহকে জানা, তাঁকে চিনে নেয়া এবং তাঁর গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার পর জীবনকে তাঁর হুকুমের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে হলে নামায কায়েম করার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। যদি দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হতে হয় তাহলে নামায কায়েম করা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো পথ নেই।

নামায কায়েম করা ও নামায পড়ার মধ্যে একটা পার্থক্য অবশ্যই আছে। নামায কায়েম করা মানে হচ্ছে, নামায পড়ার জন্যে যত রকম নিয়ম কানুন আছে সব ঠিকমত ও ভালোভাবে মেনে চলা। যেমন পাক-পবিত্রতা, সময়ের প্রতি নজর রাখা, জামায়াতের সাথে নিষ্ঠা, মনোযোগ ও বিনয়-নম্রতা সহকারে নামায পড়া। জেনে বুঝে এমন কোনো কাজ না করা যাতে নামাযে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়।

শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর গুণাবলী মেনে নেয়া এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো মেনে চলাই একজন মুসলমানের জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই হযরত লোকমান এসব কথা বলার পর তাঁর ছেলেকে একথাও বলেছেন ঃ "হে আমার প্রিয় পুত্র! মানুষকে ভালো কাজ করার আদেশ দাও এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখো।" আসলে দুনিয়ায় মুসলমান হয় আল্লাহর সেনা। দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমানী হতে দেখলে সবার আগে মুসলমান বাধা দেয়ার জন্যে এগিয়ে যায়। মুসলমান কেবল নিজে ভালো হয়ে যাওয়াকে যথেষ্ট মনে করে না বরং অন্যকেও ভালো করা এবং তাকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করাকেও সে নিজের কর্তব্য মনে করে। এজন্যে শুধুমাত্র উপদেশ ও অনুরোধ যথেষ্ট হয় না। কারণ যারা আল্লাহর হুকুম মানেনা, তারা নাফরমানী

করে এবং অসৎ পথে চলে। তারা দুচার কথায় নিজেদের পথ ছেড়ে ভালো পথে চলে আসতে রাজী হয় না। তারা বাধা দিতে থাকে। ফলে আল্লাহর সৎ মুমিন বান্দাদের জন্যে এটা হয় বেশ কঠিন পরীক্ষার সময়।

তাই হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে এ কঠিন সংকটের মোকাবেলা করার জন্যে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ "হে প্রিয় পুত্র! এ পথে যেসব বাধা-বিপত্তি আসে, ধৈর্য্যের সাথে তার মোকাবেলা করো। এটাই মানুষের করার মতো সবচেয়ে বড় কাজ।"

আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহবান করার হিম্মত এবং দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য সহকারে এ পথে সমস্ত প্রতিকুলতার মোকাবেলা করার সাথে সাথে আর একটা জিনিসেরও প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে চারিত্রিক মাধুর্য। যে ব্যক্তি কোমল স্বভাবের নয় এবং মানুষের সাথে অমায়িক ব্যবহার করতে পারে না, সে কখনো আল্লাহর দীনের একজন ভালো আহ্বায়ক হতে পারে না। একজন বদমেজাজী ও অহংকারী কখনো অন্যের মনে নিজের কথা প্রবেশ করাতে পারে না।

তাই হযরত লোকমান নিজের ছেলেকে যে শেষ ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ নসীহতটি করেন সেটা হচ্ছেঃ "হে প্রিয় পুত্র! অহংকারের বশে মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না। গর্বভরে বুক চিতিয়ে মাটির ওপর চলাফেরা করো না। আল্লাহ্ অহংকারী ও নিজেদের যারা বড় মনে করে তাদেরকে মোটেই পছন্দ করেন না। মাটির ওপর দিয়ে যখন চলবে ভালো লোকের মতো চলার মধ্যে সমতা রেখে চলবে। কারোর সাথে কথা বলার সময় অনর্থক চেঁচিয়ে কথা বলবে না বরং কথা বলার ভংগী ও আওয়াজের মধ্যে সমতা রেখে কথা বলবে। গাধাকে দেখো, কেমন চিৎকার করে। সবাই জানে গাধার চিৎকার সব চেয়ে কর্কশ ও শ্রুতিকটু।"

এ হচ্ছে পুত্রের প্রতি একজন ভালো পিতার নসীহত। এগুলো পালন করে প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ে যেমন সুসন্তান হতে পারে তেমনি হতে পারে দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক।

প্রশ্নের জবাব দাও

১. হযরত লোকমান কে ছিলেন?

২. এ দুনিয়ায় সব চেয়ে বড় জুলুম কি?

৩. কুরআনে বাপ-মায়ের অধিকার প্রসংগে মায়ের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?

৪. নামায কি? নামাযের প্রয়োজন কেন?

৫. হযরত লোকমানের শেষ নসীহতটি কি ছিল?

'কি হে তোমাদের কি হয়ে গেলো, খাচ্ছোনা কেন? এতো এতো সব খাবার-দাবার, ফল-ফলার, মিষ্টান্ন। নাও আর দেরী করো না। সবাই মেলায় চলে গেছে এবার নিশ্চিন্তে খেতে থাকো।'

'কি ব্যাপার, তোমাদের হলো কি? কেউ কোনো কথা বলছো না কেন?'

'তোমরা না সবার প্রার্থনা পূর্ণ করে থাকো। যে যা চায় তাকে তাই দিয়ে দাও। কিন্তু কই কেউ তো দেখি একটু নড়াচড়াও করতে পারো না। আমি জানি তোমরা মাটি আর পাথরের তৈরী মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নও।'

এই বলে হাতের কুড়ালটা নিয়ে ঝপাঝপ মারতে থাকলেন কোপ মূর্তিগুলোর ঘাড়ে, মাথায়, কোমরে, পিঠে, যার যেখানে হাত চলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। এখন রয়ে গেলো শুধু বড় মূর্তিটা। ওটাকে আর না ভেঙ্গে ওটারই গলায় ঝুলিয়ে দিলেন কুড়ালটা এবং তারপর বেরিয়ে পড়লেন মন্দির থেকে।

বেলা শেষে মেলা থেকে লোকেরা ফিরে আসতে লাগলো। জনসমাগমে শহর আবার গমগম করতে লাগলো। কিন্তু মন্দিরের মধ্যে ঢুকে তো লোকদের চোখ ছানাবড়া। ঠাকুর-দেবতাদের একি অবস্থা! ভেঙ্গেচুরে চারদিকে একেবারে ছত্রখান হয়ে আছে! যেন বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেছে। এদের এ অবস্থা করলো কে?

'নিশ্চয়ই এ সেই যুবকটির কাজ', কয়েকজন একসাথে বলে উঠলো, 'তাকে আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে যা তা বলতে শুনেছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই। সেতো মেলায় যায়নি। বলছিল তার শরীর নাকি খারাপ।' পাশ থেকে আরো কয়েকজন ফুঁসে উঠলো। 'তার নাম বুঝি ইবরাহিম।'

কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত ইবরাহিমকে পাকড়াও করে আনা হলো মন্দিরের মধ্যে। সব লোকেরা সেখানে জড়ো হয়ে গিয়েছিল।

'তুমি এ কাজ করেছো? ইবরাহিম! তুমিই কি এ দুর্গতি করেছো আমাদের দেবমূর্তিগুলোর?'

'বাহ! অবাক করলে তোমরা। আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? এতদিন ধরে তোমরা এদের পূজা করে এলে। এতো ক্ষমতা এদের। কত বড় বড় জিনিস তোমরা এদের কাছে চেয়েছো। এরা সংগে সংগেই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দিয়েছে। এদেরকেই জিজ্ঞেস করো, এরাই বলে দিতে পারবে। আমারতো মনে হয় এই বড়টাই এ কাজ করেছে। দেখছো না কুড়ালটা এর গলাতেই ঝুলছে।

'তুমি তো জানো ইবরাহিম, আমাদের দেবতারা কথা বলতে পারে না।'

'তাহলে ভেবে দেখো, যখন এরা কথাও বলতে পারে না, নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারেনা, তখন তোমাদের সাহায্য করবে কেমন করে? তোমরা কি এমনসব প্রাণহীন অবোধ মূর্তিদের পূজা করবে যারা তোমাদের কোন কল্যাণও করতে পারে না, কোন ক্ষতিও করতে পারে না? তোমাদের জন্যে দুঃখ হয় এবং তোমাদের এ ঠাকুর দেবতাদের জন্যেও। তোমরা আল্লাহর পূজা করনা। অথচ তিনি সকল ক্ষমতার আধার। তোমরা এই এদেরকে পূজা করো। অথচ এদের কোন ক্ষমতাই নেই। তোমরা একটু বুদ্ধি খাটাও, চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করো।'

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দুঃসাহসের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। উত্তেজিত লোকেরা তাঁর চার পাশে জড়ো হতে লাগলো। দেখতে দেখতে জমায়েত অনেক ভারী হয়ে উঠলো। সুযোগ বুঝে হযরত ইবরাহিম সবাইকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন ঃ

"আমি অবাক হচ্ছি, নিজের হাতে তোমরা যেসব মূর্তি তৈরী করো তাদেরকেই আবার পূজা করো। কিন্তু আসলে তোমাদেরকেতো আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কিছু তৈরী করো তা সবই তাঁরই সৃষ্টি।"

জনসমুদ্রে হযরত্ ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপদেশের কোন প্রভাব পড়লো না। তারা তো হুজুগে মেতে উঠেছিল। হুজুগের কাছে সত্য ও যুক্তির কোন দামই ছিল না। উল্টো তারা মারমুখী হয়ে উঠলো। দেবতাদের বিরুদ্ধে গোস্তাখী করার জন্যে তাঁর উপর চড়াও হলো। একদল বললো, 'চলো তাকে বাদশাহর কাছে নিয়ে যাই। বাদশাহর আদেশে তাকে চরম শাস্তি দিতে হবে।' ইতিমধ্যে বাদশাহর দরবারেও এ খবর পৌঁছে গিয়েছিল। এ সময় ইরাকের বাদশাহর উপাধি ছিল নমরূদ। নমরূদ কেবল প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাই ছিল না বরং সে তাদের খোদা ও উপাস্য হিসেবেও নিজেকে জাহির করেছিল। ফলে প্রজারা বিভিন্ন দেব-দেবীর সাথে সাথে তারও পূজা করতো।

হযরত ইবরাহিমের ঘটনা শুনে নমরূদ ক্ষেপে গেলো। সে ভাবলো ইবরাহিমকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে সে আমার খোদায়ীতো আছেই এমনকি আমার বাদশাহীর জন্যেও চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই তাঁকে উচিত শাস্তি দেয়ার জন্যে দরবারে হাজির করলো। নমরূদ বললো ঃ

'তোমার এত বড় স্পর্ধা, আমার রাজ্যে বাস করে আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম অস্বীকার করো? আমাকে খোদা বলে মানো না?'

'আমি এক আল্লাহর ইবাদত করি' হযরত ইবরাহিম (আ) বললেন, 'তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। পৃথিবী, আকাশ ও এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে এ সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি সবার মালিক ও প্রভু। তুমিও আমাদের মতো একজন মানুষ। কাজেই তুমি কেমন করে খোদা বা উপাস্য হতে পারো? এবং এই প্রাণ ও বাকশক্তিহীন মাটি ও পাথরের মূর্তিগুলোই বা খোদা হয় কেমন করে?'

নমরূদ বললো, 'আমি ছাড়া যদি তোমার অন্য কোন রব থাকে, তাহলে তার এমন কিছু গুণাবলী বর্ণনা করো, যেগুলো আমার মধ্যে নেই।'

হযরত ইবরাহিম (আ) বললেন, 'আমার রব জীবন ও মৃত্যুর অধিকারী। তিনিই মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই জীবন দান করেন।'

নাদান বাদশাহ নমরূদ জীবন ও মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য না বুঝে বলে দিল, 'আমিও জীবন মৃত্যু দান করি।' এই বলে তখনই একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধরে এনে হত্যা করলো এবং একজন ফাঁসির আসামীকে মুক্তি দিয়ে দিল। তারপর ইবরাহিমের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, দেখলেতো আমি কিভাবে জীবন ও মৃত্যু দান করি, এখন বলো কোথায় থাকলো তোমার খোদার বিশেষ গুণ?'

হযরত ইবরাহিম (আ) বুঝতে পারলেন, নমরূদ তার লোকদের ধোকা দেবার চেষ্টা করছে অথবা সে জীবন ও মৃত্যুর রহস্য বোঝে না। কাউকে ফাঁসির মঞ্চ বা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো তো তাকে জীবন দান এবং কাউকে হত্যা করা তো তাকে মৃত্যু দান করা হয় না। এর ফলে ঐ ব্যক্তি জীবন ও মৃত্যুর মালিক হয়ে যায় না। জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ক তো প্রাণের সাথে। কোন ব্যক্তিকে বাঁচাবার পর সে কি তার প্রাণের মালিক হয়ে যায়? সে ব্যক্তির প্রাণ কি তার হাতে এসে যায়? অথবা কোন ব্যক্তিকে মেরে ফেলার পর তার প্রাণ কি তার হাতে এসে যায়? হত্যাকারী কি নিহত ব্যক্তির প্রাণের মালিক

হয়ে যায়? তার প্রাণতো তার নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যায়, যেখানে হত্যাকারীর কোন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই। হত্যাকারী কেবল তার মরা দেহটা আগলে থাকতে পারে, যার মধ্যে প্রাণ নেই। তাহলে প্রাণ তার হাত ছাড়া হয়ে যায়। ফলে প্রকৃত পক্ষে হত্যাকারী ও জীবনদানকারী জীবন ও মৃত্যুর মালিক হয় না। জীবন ও মৃত্যুর মালিক হন তার স্রষ্টা আল্লাহ। কিন্তু সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ভুল বুঝার অবকাশ ছিল এবং নমরূদ তারই আশ্রয় নিয়েছিল।

এতে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আসল উদ্দেশ্য সফল হচ্ছিল না। তিনি চাচ্ছিলেন আল্লাহর একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে। তাই তিনি এবার আরো সহজ ও সোজা কথায় চলে এলেন। এবার তিনি বললেন, 'আমি এমন এক আল্লাহকে মানি যিনি পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠান, তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে উঠাও।" এ কথায় নমরূদ হতভম্ব ও লা-জওয়াব হয়ে গেলো। কারণ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠাবার ক্ষমতা তার ছিল না। কাজেই সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্যে সে এবার আর বলতে পারলো না, ঠিক আছে দেখো আমি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠাচ্ছি।

এভাবে সত্যের কাছে মিথ্যা চিরকাল লা-জওয়াব হয়ে এসেছে। কিন্তু তার গোঁড়ামি যায়নি। এটা তার চিরকালের স্বভাব।

গল্পটি কুরআনের আলোক রচিত

প্রশ্নের জবাব দাও

১. মূর্তিরা কি কথা বলতে পারে? কাউকে সাহায্য করতে পারে? কারোর কল্যাণ করতে পারে?
২. লোকেরা মেলায় গেলে হযরত ইবরাহিম মন্দিরের মধ্যে কি করেছিলেন?
৩. হযরত ইবরাহিমের সময় ইরাকের বাদশাহ কে ছিল? সে নিজেকে কি বলে দাবী করতো?
৪. জীবন ও মৃত্যুর প্রকৃত মালিক কে? কেমন করে?
৫. হযরত ইবরাহিম কিভাবে নমরূদকে লা-জওয়াব করেছিলেন?

বনি ইসরাঈলের জ্ঞানী বৃদ্ধা

'আমার মনে হচ্ছে আমরা পথ ভুল করেছি।'

'এ কেমন করে হতে পারে হযরত? আপনি আল্লাহর নবী। আপনি পথ ভুল করবেন কেন?'

'মনে হচ্ছে আল্লাহ আমাদের পথ ভুল করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের অথৈ দরিয়া পার করিয়ে দিলেন। জালেম ফেরাউনকে ও তার লোক-লস্করকে দরিয়ার পানিতে ডুবিয়ে মারলেন। কিন্তু এ পারে এসে তো কোনো পথের দিশা পাচ্ছি ন।' বললেন আল্লাহর নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম।

'কিন্তু দরিয়ার ওপারে যখন আমরা ছিলাম, পেছন থেকে ফেরাউন ও তার লোক লস্কররা যখন আমাদের তাড়া করে ফিরছিল তখন তো আপনাকে পথের জন্যে পেরেশান হতে দেখিনি।' বলল একজন ইসরাঈলী জোয়ান।

'কথাটা ঠিকই বলেছো। এটাতো পেরেশানীর কথা, চিন্তার কথা।' একজন বয়োবৃদ্ধ ইসরাঈলী বললো। 'তবে আমাদের আলেম ও লেখাপড়া জানা লোকেরা অনেক কথাই জানে, তারা এ ব্যাপারে কি বলে?'

একজন ইসরাঈলী আলেম বললো, 'হ্যাঁ, একটা কথা আমাদের বাপ-দাদাদের মুখ থেকে শুনেছিলাম। সেটাই হয়তো আমাদের এই পথ ভুলের কারণ হতে পারে।'

'কি সে কথা?'

'কেন? তোমাদের অনেকেই তা শুনেছো। তবে সেটাকে হয়তো এর সাথে মেলাতে পারছো না।'

'বলুন তো ব্যাপারটা কি? আমরা তো কিছুই ভাবতে পারছি না।

'কেন তোমরা শোনোনি? মিসরে বনি ইসরাঈলী মিল্লাতের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ইন্তিকালের সময় আমাদের পরদাদাদের থেকে এই মর্মে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তাঁর কবর থেকে তাঁর হাড্ডিগুলো উঠিয়ে সাথে না নিয়ে তারা এদেশ ত্যাগ করবে না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা শুনেছি।' অনেক আলেম একসাথে বলে উঠলো। আমাদের পথ ভুল হওয়ার এটা একটা কারণ হতে পারে।'

হযরত মূসা বললেন, 'আমাদের পূর্ব পুরুষদের ওয়াদা অবশ্যই আমাদের পালন করতে হবে। তার ওপর আমাদের মহান নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দিলের খাহেশ পূরণ করা আমাদের জন্যে একটি অবশ্য করণীয় কাজ। আল্লাহ তাঁকে এদেশে

এনেছিলেন। তিনি ছিলেন এদেশে আমাদের প্রথম পুরুষ। তাঁর দিনগুলো ছিল অত্যন্ত মর্যাদা ও গৌরবের। আমাদের পূর্ব পুরুষরা ছিল কৃষি ও পশু পালনে অভ্যস্ত। তিনি তাদেরকে মিসরের নগর জীবনের সাথে জড়িত না করে গ্রামে ও পাহাড়ে জঙ্গলে আবাদ করেন। তাই শত শত বছর পরে আজো আমরা নগরবাসীদের শিরকী জীবনে অভ্যস্ত হইনি। আমরা আজো আল্লাহ ও তাঁর নবীর দীন ও শরীয়ত মেনে চলছি।'

'হে আল্লাহর নবী, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের আজকের তওহিদী জীবন, আমাদের ইবাদত-বন্দেগী এবং আল্লাহর শরীয়ত মেনে চলার জন্যে আমাদের স্বাভাবিক আকাঙ্খা এ সব কিছুর পেছনে আমাদের মহান পূর্ব পুরুষ এবং আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সেদিনের সিদ্ধান্ত অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে।' বললেন একজন বনি ইসরাঈলী আলেম।

'হ্যাঁ, ঠিকই। যদি আমরা নগরবাসী হতাম। নাগরিক জীবনের আরাম আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে পড়তাম। মিসরীয়দের মতো আল্লাহর ইবাদত না করে হয়তো পুতুল পূজাই করতাম।' বললেন আর একজন আলেম।

'আল্লাহর বড় মেহেরবাণী। তিনি আমাদের তাঁর সঠিক দীনের অনুসারী রেখেছেন।' বললেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। 'আর এটি সম্ভব হয়েছে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঠিক সিদ্ধান্তের ফলে।'

হযরত মূসা আবার বললেন, 'কাজেই আমাদের এদেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় তাঁর হাড়-গোড়গুলো আমাদের সাথে নিয়ে গিয়ে আমাদের পিতৃভূমিতে কবরস্থ করার যে দাবী তিনি করেন তা আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর কবর কোথায়? কে বলতে পারে একথা?

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। তারপর কিছু লোক বলে উঠলো, 'হাঁ, একথা বলতে পারে মাত্র একজনই।'

'কে সে? তার নাম বলো। কোথায় থাকে?'

'সে এক বৃদ্ধা। অতিরিক্ত বয়সের ভারে ন্যুব্জ পৃষ্ঠ এক বনি ইসরাঈলী বৃদ্ধা।'

তার কাছে একজনকে পাঠালেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম।

তাকে ডেকে আনলেন।

তাকে নিজের কাছে বসালেন। বললেন, 'বুড়িমা, আপনি কি আল্লাহর প্রিয় নবী এবং আমাদের মহান পূর্ব পুরুষ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কবরটি কোথায় তা আমাদের দেখিয়ে দেবেন?'

'আল্লাহর কসম আমি দেখাবো না। তবে একটি শর্ত আছে যদি শর্তটি পূরণ করেন তাহলে অবশ্যই দেখিয়ে দেবো।'

'শর্তটি কি বলুন।'
'শর্তটি হচ্ছে আপনাকে ওয়াদা করতে হবে জান্নাতে আমি আপনার সাথে থাকবো।'
আল্লাহর নবী মূসা বনি ইসরাঈলের এই বৃদ্ধার শর্তটি পছন্দ করতে পারলেন না। কারণ এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ব্যাপার। কেবলমাত্র নেকীর জোরে বা কারোর সুপারিশে কেউ জান্নাতে যাবেনা। আল্লাহ কাকে জান্নাতে নেবেন আর কাকে নেবেন না এটা তাঁর এখতিয়ার।
মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন বৃদ্ধার শর্ত মেনে নাও।
কাজেই হযরত মূসা বললেন, 'বুড়িমা আমি আপনার শর্ত মেনে নিলাম।'
আনন্দে বনি ইসরাঈলের বৃদ্ধার দুটি চোখ চকচক করে উঠলো। যেন সেখানে ঝাড় লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন সাত রাজার ধনের চেয়ে অনেক বেশি কিছু তার হাতে এসে গেছে।
'আমার সাথে এসো' বলে বৃদ্ধা হাঁটা দিল একদিকে। বৃদ্ধার পেছনে পেছনে চললো সবাই।
একসময় সবাই এসে পৌঁছুলো একটি পানি ভরা ডোবার কাছে।
'পানি ছেঁচে ডোবাটা খালি করো।'
সবাই পানি ছেঁচার কাজে লেগে পড়লো।
এক সময় ডোবাটি পানি শূন্য হলো।
'এবার কোদাল আনো'। ডোবার মাঝখানের মাটি কেটে উপরে ওঠাও।
ঠকঠক আওয়াজ শুরু হলো। মাটির নিচ থেকে বের হয়ে এলো একটি শরীরের হাড়গোড়।
হযরত মূসা হাড়গুলো জমা করলেন। সেগুলো নিয়ে আবার রওয়ানা হলেন।
এবার পথ তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো দিনের আলোর মতো।

মুসতাদরাক হাকেম বর্ণিত একটি হাদীসের ভিত্তিতে গল্পটি রচিত।

প্রশ্নের জবাব দাও

১. আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) কখন এবং কোথায় পথ ভুল করেছিলেন?
২. কেন পথ ভুল করেছিলেন?
৩. হযরত ইউসূফ (আ) এর কবরের সন্ধান কে জানতো?
৪. কবরটির অবস্থান কোথায় ছিল?
৫. বনি ইসরাঈলের বৃদ্ধা কবরটি দেখাবার জন্যে কি শর্ত আরোপ করেছিল?
৬. কে জান্নাতে যাবে?

আল্লাহর নবী ও পিঁপড়ে

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে জীব ও জড় যাকিছু সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা অনুভূতি আছে। মানুষ ছাড়া তাদের প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছায় এবং সচেতনভাবে আল্লাহর তাসবীহ পড়ছে, তাঁর গুনগান ও প্রশংসা করছে। মানুষ চাইলে আল্লাহর গুনগান করতে পারে আবার চাইলে নাও করতে পারে। এ স্বাধীনতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। তবে আল্লাহর গুনগান করলে মানুষের লাভ। আর আল্লাহর গুনগান না করলে মানুষের ক্ষতি।

পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা সবাই আল্লাহর তাসবীহ পড়ে, তাঁর গুনগান করে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, 'কিন্তু তাদের তাসবীহ পড়া এবং তাদের আল্লাহর গুনগান করা তোমরা বুঝতে পারো না।'

ছোট্ট একটা পিঁপড়েও আল্লাহর তাসবীহ পড়ে। এ সম্পর্কে হাদীসের একটা ঘটনা আজ তোমাদের শুনাবো। দুটি প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ বুখারী ও মুসলিমে এ ঘটনাটির কথা বলা হয়েছে।

কয়েক হাজার বছর আগের একটা ঘটনা। আল্লাহর এক নবী মনে হয় অনেক দূরের সফর থেকে আসছিলেন। সংগে ছিল তাঁর লোকজন। অনেক মালসামান সফর সামগ্রী। ছিলেন শ্রান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। চাইলেন একটু বিশ্রাম ও আরাম করতে। একটা বড় গাছ দেখলেন। তার ছায়ায় নেমে পড়লেন। মাল সামান গাছের নিচে রেখে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন তার ছায়ায়। সবেমাত্র চোখ বুজেছেন এমন সময় কুট করে কামড় দিল একটা ডাঁশা পিঁপড়ে। তাঁর কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তিনি বিরক্ত হলেন, রেগে গেলেন খুব। খুব মানে অনেক বেশি।

আল্লাহর নবী হলেও সবার মতো তিনিও মানুষ। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায় ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে লোকদের হুকুম দিলেন, গাছের নিচে আমাদের যা মাল সামান জিনিসপত্র আছে সব বের করে নিয়ে এসো।

জিনিসপত্র সব বের করে নিয়ে এসে বাইরে এক জায়গায় জড়ো করা হলো, তারপর হুকুম দিলেন,

পিঁপড়ের সারিগুলোতে, ওদের ঢিবিগুলোতে এবং ওদের আবাসগুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও।

কাজেই শত শত হাজার হাজার পিঁপড়ে পুড়ে মারা গেলো। আল্লাহ তাঁর নবীর একাজটি অত্যন্ত অপছন্দ করলেন। সংগে সংগেই অহীর মাধ্যমে নবীকে তাঁর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের কথা জানিয়ে দিয়ে বললেন, প্রতিশোধ নিতে হলে একটি পিঁপড়ে মারতে যে

তোমাকে কামড়েছিল। কিন্তু একজনের দোষে পিঁপড়ের একটা দল এবং একটা উম্মতকে খতম করে দেয়া কোন ধরনের ইনসাফ? অথচ এরা আমার তাসবীহ ও গুনগান করে।

তাই বিনা কারণে কোনো পিঁপড়েকে মারা যাবে না। কেবল পিঁপড়ে কেন, কোনো নিরীহ প্রাণীকে বিনা কারণে হত্যা করা যাবে না। বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে চারটি প্রাণীর নাম নিয়ে তাদেরক মারতে নিষেধ করেছেন। সেই চারটি প্রাণীর একটি হচ্ছে পিঁপড়ে। দ্বিতীয়টি মৌমাছি, তৃতীয়টি হুদ হুদ পাখি। আর চতুর্থটি হচ্ছে, সুরদ নামক একটি বিশেষ পাখি। তবে সাপ, বিছা ইত্যাদি যেসব প্রাণী মানুষের ক্ষতি করে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করেছেন।

পিঁপড়ে সম্পর্কে আল্লাহর আর এক নবীর কথা তোমাদের বলবো। খৃষ্টপূর্ব ৯৬৫ থেকে নিয়ে ৯২৬ অব্দ পর্যন্ত ৪০ বছর আল্লাহর এই নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম ফিলিস্তীন, জর্দান ও সিরিয়া এলাকা শাসন করেন। আল্লাহ তাঁকে বিভিন্ন প্রাণীর ভাষা শিখিয়েছিলেন। তাঁকে পিঁপড়ের ভাষাও শিখিয়েছিলেন।

একদিন তিনি তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এমন একটি উপত্যকায় পৌঁছুলেন যেখানে ছিল পিঁপড়েদের আবাস। পিঁপড়েদের সরদার বুঝতে পারলো সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও তাঁর সেনাবাহিনী তাদের এই এলাকার ওপর দিয়ে যাবেন। সরদার ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। সে তার দলবলকে হুকুম দিল, তোমরা বাইরে ঘোরাফেরা করোনা। তাড়াতাড়ি যার যার ঘরে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাও। সুলাইমান তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে এখনই এখান দিয়ে যাবেন। তাদের পায়ের তলায় তোমরা পিষ্ট হয়ে যাবে। অথচ তারা এর কিছুই জানতে পারবেনা।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম দূর থেকে পিঁপড়ের সরদারের কথা শুনতে পেলেন। আল্লাহ তাঁকে এ ক্ষমতা দান করেছিলেন। এ জন্যে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। ফলে তাঁর ও তাঁর সেনাদলের চলাচলে পিঁপড়েদের কোনো ক্ষতি হলোনা।

তোমরা পিঁপড়েদের চলাচল করতে দেখেছো। তারা কেমন সুশৃংখল ও সারিবদ্ধভাবে চলে। কোনো খাবার সংগ্রহ করলে খাবার নিয়ে তারা চলে একটা সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর মতো। তাদের একদল খাবারটাকে ঘিরে তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। আর একটা বিশাল বাহিনী সুশৃংখলভাবে পথ তৈরি করে নিয়ে তাদের আবাস ও আস্তানার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পিঁপড়েরা একটা শৃংখলাবদ্ধ নিয়মের অধীনে জীবন যাপন করে। আল্লাহ তাদের এ জীবন যাপনের ধারা শিখিয়ে দিয়েছেন।

কীট পতংগের মধ্যে পিঁপড়েরা সবচেয়ে সুশৃংখল জীবন যাপন করে। মানুষের মতো তাদের মধ্যেও বংশধারা আছে। তারাও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। তাদের শাসক আছে। শাসকদের অধীনে তারা নিয়ম শৃংখলার সাথে বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

যখন কোনো দুশমন কোনো এলাকায় পিঁপড়েদের আবাসস্থল আক্রমণ করতে আসে তখন সেই এলাকার সমস্ত পিঁপড়ে তাদের কাজকাম বন্ধ করে দেয়। তারা দুশমনের সাথে মোকাবিলা করার জন্যে বের হয়ে পড়ে। প্রথমে তাদের মধ্য থেকে একজন দ্রুত এগিয়ে যায়। দুশমনদের সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে। সে ফিরে এসে সবকিছু জানিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর তিন চারটি পিঁপড়ে বের হয়। তাদের পেছনে এগিয়ে আসতে থাকে পিঁপড়েদের একটা বিরাট সেনাবাহিনী। তারপর শুরু হয় দুপক্ষের যুদ্ধ। যে এগিয়ে আসে তাকে কামড়ানো ও দংশন করা হয়।

আসলে পিঁপড়ে ক্ষুদ্র একটা কীট হলেও বেশ বুদ্ধিমান প্রাণী। তারা বুঝে শুনে পরিকল্পনা করে কাজ করে। তারা আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর বান্দা এবং একটি পৃথক উম্মত। কেবল পিঁপড়েই বা কেন, প্রাণী জগতের সকল সৃষ্টিই এক একটি পৃথক উম্মত রূপে বিরাজ করছে। তাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে বলেছেন ঃ

'জমিনে চলে বেড়ায় এমন কোনো প্রাণী এবং আকাশে দুই ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় এমন কোনো পাখি নেই যারা নয় তোমাদের মতো একটা উম্মত।'

তাই সমস্ত জীবের প্রতি আমাদের সদয় ও দায়িত্বশীল ব্যবহার করা উচিত।

প্রশ্নের জবাব দাও

১. কারা আল্লাহর তাসবীহ পড়ে?
২. পিঁপড়ে আল্লাহর নবীকে কামড়ালে তিনি কি করলেন?
৩. নবীর এ কাজকে আল্লাহ কিভাবে গ্রহণ করলেন?
৪. আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ করে কয়টি প্রাণীকে মারতে নিষেধ করেছেন? সেগুলো কি কি?
৫. আল্লাহর কোন নবী পিঁপড়ের ভাষা জানতেন?
৬. তিনি কত সালে কোন দেশ শাসন করতেন?
৭. পিঁপড়েদের সরদার বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ছিল কেন?
৮. পিঁপড়েরা কিভাবে তাদের শত্রুদের মোকাবিলা করে?